KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৮/- ৮/- ৮/- ৮/- ৮/-	Year of Publication : বৈশাখ, ১৩৬৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ আষাঢ়, ১৩৬৭ শ্রাবণ, ১৩৬৭ ভাদ্র, ১৩৬৭
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ

২৪ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা-১২,

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

অষ্টম বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আপনার ছেলে কি ভুগছে —
নির্জীব, দুর্বল, খিটখিটে ?

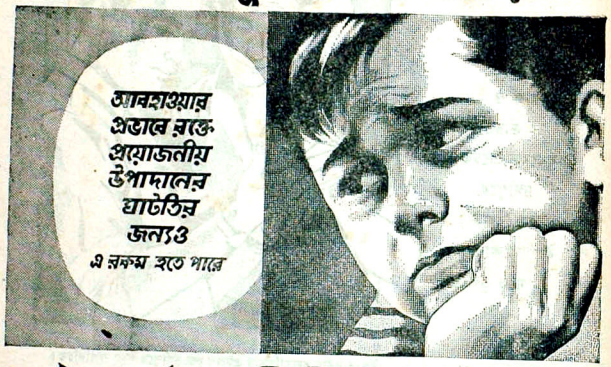

MANDH মান্ধ এলিক্সিয়ার রক্তে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে

এই রুক্ষ আবহাওয়ায় ছেলেমেয়েরা তাদের সঞ্চিত শক্তির অনেকখানি খরচ করে ফেলে অথচ হারানো শক্তি পুষিয়ে নেবার মত ঠিক যে খাদ্যের দরকার প্রায়ই তারা তা পায় না। এ থেকে তাদের রক্তে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি দেখা দেয় যার ফলে তারা নির্জীব, দুর্বল, রুগ্ন ও খিটখিটে হয়ে পড়ে। আবহাওয়ার প্রভাবে রক্তে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি পূরণ করতে আপনার ছেলেমেয়েকে নিয়মিত মান্ধ এলিক্সিয়ার খেতে দিন। এতে তাদের রক্ত সতেজ হয়ে হারানো শক্তি ফিরে আসবে। মান্ধ মল্টেড বি-কমপ্লেক্স এলিক্সিয়ার একটি চমৎকার সুগন্ধযুক্ত কার্যকরী টনিক যাতে বি-কমপ্লেক্স ভিটামিন শ্রেণীর সমস্ত ভিটামিন, এমনকি বি,₂ আছে—তাছাড়া এতে আছে মল্ট এক্সট্র্যাক্ট ও গ্লিসারোফসফেট।

আপনার ছেলেমেয়েকে নিয়মিত মান্ধ এলিক্সিয়ার খেতে দিয়ে সারা বছর তাদের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখুন।

MANDH মান্ধ এলিক্সিয়ার আপনাকে সুস্থ ও চাঙ্গা রাখবে
মার্টিন অ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিঃ, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নিউদিল্লী

অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা **সমকালীন** জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

॥ সূচীপত্র ॥

নাট্যশাস্ত্রের সাধারণ পরিচয়। অমিয়নাথ সান্যাল ৮৯

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ছোট গল্প। শিশিরকুমার দাশ ১০১

এমিল জোলা ও সাহিত্যে বাস্তববাদ। মনোজ রায় ১০৬

সমালোচনা ও সত্য। পুণ্যশ্লোক রায় ১১২

সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা। ঋতেন্দ্রকুমার রায় ১১৩

অথ ষ্টেট বাস কথা। নির্মলেন্দু সান্যাল ১১৭

নট-নাটক ও নাট্যকার। রবি মিত্র ১২০

সংস্কৃতি ও স্বনারি। উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ১২৩

দুর্নীতি : সমাজ ও সরকারী দপ্তর। অভী দাস ১২৬

সমালোচনা—সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ১২৯

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

নতুনের অভিযান...

দিকে দিকে আজ নতুনের অভিযান—নবীন
শিশুর আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন বয়ে নিয়ে আসে নতুনের সংকেত,
সাড়া জাগে লক্ষ মানুষের প্রাণে, তারা জেগে ওঠে, চেষ্টা
দিয়ে, কর্ম দিয়ে জাতিকে তারা নতুন করে গড়বেই.....মহৎ
কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রান্তিময়,
ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে।
বৈচিত্র আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।
কালের জড়তা ভুলে অতীতের এক মহান
জাতিও আজ তাই জেগেছে, পেয়েছে সে নতুনের আহ্বান.....

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও...দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR 2-X52 BG

অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

সমকালীন

জ্যৈষ্ঠ তেরশ' সাতষট্টি

নাট্যশাস্ত্রের সাধারণ পরিচয়

অমিয়নাথ সান্যাল

সহজ যুক্তি অবলম্বন করে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সমগ্র রচনা ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

১। আন্তরিক প্রমাণ-পরিচয় অনুযায়ী সমগ্র রচনা ও পরিকল্পনার মুখ্য অংশ দুইভাগে বিভক্ত, যথা—নাম **নাট্য-সংগ্রহ** ও **গান্ধর্ব-সংগ্রহ**। নাট্যসংগ্রহের ব্যাপ্তি ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকে ২৮শ অধ্যায়ের প্রারম্ভিক অংশ পর্যন্ত। গান্ধর্ব সংগ্রহের ব্যাপ্তি ২৮শ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক থেকে ৩২শ অধ্যায়ের সর্বশেষ ৪৮৪ শ্লোক পর্যন্ত।

এই দুটি মুখ্য বিভাগকে আমরা নাট্যশাস্ত্রের দুই কান্ড মনে করতে পারি। কা-সংস্করণে ২৮শ অধ্যায় থেকে ৩৩শ অধ্যায় পর্যন্ত গান্ধর্ব-সংগ্রহের ব্যাপ্তি দেখা যায়।

২। গ্রন্থের ৩৩শ অধ্যায় থেকে ৩৫শ অধ্যায় পর্যন্ত অংশ নাট্য-গান্ধর্ব বিষয়ে মিশ্র পরস্পর-সম্বন্ধী উপদেশগুলি গ্রথিত। কান্ড থেকে উদ্‌ভূত অথচ পরস্পর-সংলগ্ন এই রচনাংশকে 'পল্লব' মনে করতে পারি। কা-সংস্করণে ৩৪শ অধ্যায় থেকে ৩৬শ (বা ৩৫শ অধ্যায়, অধ্যায়-নাম প্রমাদগ্রন্থ) অধ্যায় পর্যন্ত পল্লবের ব্যাপ্তি।

সাধারণ দৃষ্টিতে, ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকে ৩৫শ অধ্যায় পর্যন্ত পরিকল্পনাই হ'ল নাট্যশাস্ত্রের স্বরূপ। সপল্লব কান্ড বিস্তারী এই মহীরুহ ছিল নাট্যসম্প্রদায়ের সর্বোত্তম আধার। **সম্প্রদায়ের অর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান কলা-শিল্পের ধারা প্রবাহ**। নাট্যশাস্ত্র বেদার্থবাচক হ'লে এ স্থলে নাট্য-সম্প্রদায় না বলে নাট্য-আম্নায় বলা যেত। কিন্তু নাট্য-সম্প্রদায় কখনও আম্নায় রূপে সমাদৃত হয়নি। কারণ নাট্যশাস্ত্র বেদার্থ প্রতিপাদক ছিল না।

৩। বিরাট মহীরুহের চতুষ্পার্শ্বেও সংলগ্নভাবে যেমন **ছায়া-ভূমি** থাকে, নাট্যশাস্ত্রের স্বরূপ অংশের দুই পার্শ্বেও সংলগ্নভাবে ১ম অধ্যায় থেকে ৫ম অধ্যায় অংশ এবং সর্বশেষ ৩৬শ অধ্যায় (কা-সং ৩৬শ ও ৩৭শ অধ্যায়) ভূমিবিস্তারকে **নাট্যশাস্ত্রের ছায়া-ভূমি** মনে করতে বাধা নেই।

কেন্দ্রীভূত বৃক্ষটির কান্ড-পল্লব-অনুপল্লবগুলি জ্ঞান-বিজ্ঞানময় বিচিত্র অথচ সমুহাল-ম্বনাত্মক নাট্যধর্মকে প্রতিভাত করে। বৃক্ষের সংলগ্ন ছায়া-ভূমিও বহু ও বিচিত্র ঐতিহ্য-কিম্ব-

দন্তীর আলোকসম্পাতে স্থানে স্থানে উজ্জ্বল এবং কোথাও বা রূপক-রহস্যে কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে আছে।

বলাই বাহুল্য, কেন্দ্রীভূত নাট্য-গান্ধর্বের মধ্যে অবাস্তব বা লোকোত্তর বলতে কিছু নেই। কিন্তু, ছায়া ভূমির মধ্যে অন্তত এমন একটি রহস্য-রূপক ঘটিত উপদেশ আছে, যার প্রকাশ কুজ্ঝটিকার মতো রহস্য। অথচ কুজ্ঝটিকা যেমন দূরস্থিত বস্তুকে আবৃত করেও সূর্য-চন্দ্রকে নূতন মাহাত্ম্যে আভাসিত করে এই রূপক অংশটিও সেরূপ সমস্ত লোকাচার ও লোকধর্মকে আবৃত করে নাট্য ও গান্ধর্বকে নূতন মাহাত্ম্যে আভাসিত করেছে। চৌ-সং ৩য় অধ্যায়ের ৯০ শ্লোক থেকে (কা-সং ৩য় অধ্যায় ৮৮ শ্লোক থেকে) এই রহস্য-রূপকের আরম্ভ এবং ৯৫ শ্লোকে এর সমাপ্তি। (কা-সং ৯৩ শ্লোক)। একে রূপক-রহস্য বলি এ কারণে যে বক্তব্য অংশটি যেন রূপকাকারিত, অথচ—বিধি-বিধানগুলি রহস্যাবৃত। স্থানান্তরেই এর আলোচনা করা উচিত মনে করেছি।

৪। নাট্যশাস্ত্রের কান্ড-পল্লবাংশ অল্প আয়াসেই উদ্ধার করা যায়। **এই অংশের আদ্যোপান্ত উপদেশ** আচার্যশ্রেষ্ঠ ভরতমুনির **উত্তমপুরুষ ঘটিত বাক্য দিয়ে রচিত ও গ্রথিত।** অবশিষ্ট, অর্থাৎ **ছায়া-ভূমিক অংশে সর্বথা প্রথম পুরুষ ঘটিত বাক্যাবলী রচিত ও গ্রথিত** দেখা যায়।

৫। উত্তমপুরুষ ঘটিত বাক্যের বক্তা কে, এবং নাম-পুরুষে ঘটিত বাক্যাবলীর রচয়িতাই বা কে, এরূপ প্রশ্ন নিতান্ত সমীচীন।

প্রশ্নের উত্তরে সম্ভব-অসম্ভব অনুমানই প্রধান অবলম্বন।

সুপ্রাচীন কালে ভরত (বা ভরতমুনি, বা মহামুনি ভরত) নামে একজন বহুদর্শী ও মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। গীত, বাদ্য, নৃত্ত, নৃত্য ও অভিনয় সম্বন্ধে ঐতিহ্যগত প্রমাণই এঁর অস্তিত্ব এবং বিশিষ্ট কর্মজীবনের পরিচয় দেয়। কিন্তু ভরতমুনির আবির্ভাব সম্পর্কে নিশ্চিত রূপে ঐতিহাসিক কাল-নির্ণয় অসম্ভব। ঐতিহাসিক কাল বলতে আমি ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের বা তদনুগত গবেষকদের স্বীকৃত সরকারী ইতিহাসই বলতে চেয়েছি। যাই হ'ক, যে হেতু সরকারী ইতিহাসের দৃষ্টি-বিচারে ভরত নামে জনৈক নাট্যাচার্যের আবির্ভাব কাল নির্ণীত হয়নি, অতএব ভরতমুনি নামে বস্তুত কোন লোকই ছিলেন না, এবং নাট্যশাস্ত্রের মুনি-বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত রচনা প্রয়াস, এ রকম মতও * উপস্থাপিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই মত যুক্তিহীন।

৬। নাট্যশাস্ত্রের আন্তরিক ঐতিহ্য, অনুবংশ, কিম্বদন্তী-কথার নিগলিত সার উদ্ধার করে বলা যায়, লোক-বিশ্রুত ভরতমুনি অবশ্যই গদ্য-বাক্যে কথা ও উপদেশের আকারে নাট্য ও গান্ধর্বের প্রয়োগ বিধি সমাগত শিষ্যবর্গকে শ্রাবিত করেছিলেন। অবশ্যই, তাঁর বাক্য উত্তম-পুরুষ ঘটিতরূপে উচ্চারিত হয়েছিল। নিজ বাক্যে তিনি পূর্বাচার্য বা পূর্বগ নাট্য-গান্ধর্ব বিশারদগণের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ করেছিলেন; অর্থাৎ নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের পূর্ব-পূর্ব ধারক-পোষকদের উদ্দেশ করে ঋণস্বীকার করেছিলেন। অবশ্যই তিনি কিছু কিছু পদ্য-বাক্যে পূর্বসিদ্ধ অনুবংশও উদ্ধৃত করে প্রসঙ্গপুষ্ট করেছিলেন। তাঁর স্বকীয় মত বা অভিপ্রায়ও সূচিত করেছিলেন। অবশ্যই তাঁর আবির্ভাব কালে নাট্য-গান্ধর্ব বিষয়ে সূত্র-ভাষ্যও ছিল, টীকা-পদ্ধতি ছিল এবং নিঘন্টু, নিরুক্তও ছিল। তাঁর পক্ষে সূত্র ও ভাষ্যের সংজ্ঞা-লক্ষণ বর্ণনা করার

* পূর্বে উল্লিখিত শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোর্জি শাস্ত্রী মহোদয় প্রণীত নাট্যশাস্ত্র রসাধ্যায়ের ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই সঙ্গে, শ্রীমনোমোহন ঘোষ প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের ইংরাজি অনুবাদ গ্রন্থের বিস্তারিত উপক্রমণিকার মধ্যে (পৃঃ এল একস একস ওয়ান, "ইট্স্ অথর") শীর্ষে একই প্রকার মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

প্রয়োজন হয়নি, কারণ, তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গ সূত্রভাষ্যের স্বরূপ বিদিত ছিলেন। কিন্তু, সম্ভবত ঐ শিষ্যবর্গ নিঘন্টু ও নিরুক্ত গ্রন্থরচনা পদ্ধতি অবগত ছিলেন না, অথবা যৎসামান্য রূপে অবগত ছিলেন বলে, ভরতমুনি স্পষ্ট করে নিঘন্টু নিরুক্তের সংজ্ঞা-লক্ষণ বর্ণনা করেছিলেন। নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের সারবান যাবতীয় শিক্ষা-শিক্ষণ পদ্ধতিকে গ্রথিত করে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তিনি "সংগ্রহ" শাস্ত্র রচনার নিয়ম-পদ্ধতি বিধি-বদ্ধ করে উপদেশ করেছিলেন। **কি প্রকারে কারিকা-নিবন্ধ সংগ্রহ রচনা করতে হয় তাও শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।**

এক কথায় নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা-শিক্ষণ প্রণালী, এবং প্রয়োগ-ব্যবহার ঘটিত বিধি-বিধান দ্বারা সম্প্রদায়কে কিরূপে সুরক্ষিত করা যায় এবং সেই সম্প্রদায়কে সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে কি প্রকারে সুচালিত করা যায়,—এই সমস্তই ছিল ভরত-মুনির সাক্ষাৎ উপদেশাবলীর লক্ষ্য। যে ব্যক্তি এ সমস্ত বিষয়ে স্বয়ং কৃতধী হয়ে অন্যকে শিক্ষা-দান করেন, তাঁর নাম, যশ ও কীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, এতে আশ্চর্য কি। এবং মাত্র এক ব্যক্তির পক্ষে নাট্য-গান্ধর্বের সার্বভৌম জ্ঞান-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করাও আশ্চর্য বা অসম্ভব নয়। ভারতীয় জ্ঞান-বিদ্যার অন্যান্য অধিকারে একাধিক ব্যক্তি সার্বভৌমিকতা লাভ করেছিলেন।

নাট্য-গান্ধর্বাচার্য ভরত মুনি বলতে মাত্র একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিই সূচিত হ'ত, এর প্রমাণ রয়েছে মতঙ্গ-প্রণীত 'বৃহদ্দেশী' নামক সঙ্গীত-শাস্ত্রের মধ্যে এবং শ্রীশার্ঙ্গদেব প্রণীত "সঙ্গীত-রত্নাকর" গ্রন্থের মধ্যে। "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থে বহুবার ভরত, ভরতমুনি, এমন কি মাত্র 'মুনি' নাম উল্লেখ করে নাট্যশাস্ত্র থেকে বচন, এমন কি, বৃহদায়তন শ্লোকগুচ্ছ উদ্ধৃত আছে। কিন্তু,—এবং বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে 'নাট্য-শাস্ত্র' নামটির বারম্বারও উল্লেখ নেই। বৃহদ্দেশী প্রণেতা 'সংগ্রহ-শাস্ত্র' নামটি এমন স্থানে এমন ভাবে উল্লেখ করেছেন যা থেকে মনে হয় গ্রন্থকারের কালে 'নাট্য-শাস্ত্র' নামটি ছিল না, এবং তৎপরিবর্তে "সংগ্রহ-শাস্ত্র" নাম ছিল। "সংগ্রহ-শাস্ত্র" বলতে "নাট্য-গান্ধর্ব সংগ্রহ" ছাড়া অপর কোনও শাস্ত্র অনুমান করা যায় না।

পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে অথবা কাব্যের মধ্যে 'ভরত' বা "ভরত মুনি" নামের অনুল্লেখ যদি সত্যও হয়, তা হ'লেও প্রমাণ করা যায় না যে নাট্য-গান্ধর্বাচার্য ভরত মুনি বলতে কেউ ছিল না। "বৃহদ্দেশী" সঙ্গীতগ্রন্থ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালের বহু সঙ্গীতগ্রন্থে ভরতের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখা যায়। ভরত মুনির মরদেহে অস্তিত্বের পক্ষে এই প্রমাণই যথেষ্ট। পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত ও কাব্য ভরতোপদিষ্ট নাট্যশাস্ত্রের সজাতীয় নয়। সজাতীয় গ্রন্থ হ'লে নামোল্লেখের আশা করা যায়। বিজাতীয় গ্রন্থ বা সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রে নামোল্লেখের আশা করা যায় না; অনুল্লেখ মাত্র দিয়ে কিছু প্রমাণও করা যায় না।

পক্ষান্তরে, 'ভরত'-নাম সম্বন্ধে অন্য রহস্যও আছে। প্রথমত, যথা, মতঙ্গ-ভরত, কোহল-ভরত নন্দী-ভরত নামগুলি। এর অর্থ এই যে—ভরত-প্রবর্তিত নাট্যসম্প্রদায়ের ক্রমোন্নতির সময়ে পরম্পরাগত সূত্রধারগণের কেহ কেহ 'ভরত' উপাধিতে বিশেষিত হয়েছিলেন। নাট্যোপদেষ্টা ভরত মুনির পক্ষে এই রকম ঘটনা গৌরবেরই সূচক। দ্বিতীয়ত, পরবর্তীকালের নাট্য-গান্ধর্ব সংশ্লিষ্ট 'নট' শ্রেণীর ব্যক্তিগণ গৌরবার্থেই নিজেদেরকে "ভরত" নাম দিয়ে পরিচিত করতেন। বলাই বাহুল্য, এই সময়ে ভরত প্রবর্তিত নাট্য-সম্প্রদায়, তথা আচার্য-সূত্রধার প্রণালীর লোপ ঘটেছিল। এবং নট-কুশল ব্যক্তিবর্গ মাত্র প্রয়োগবৃদ্ধি সম্বল করে নাট্য-গান্ধর্বের প্রয়োগ করতেন। এই সময় থেকে 'নট' প্রায়ই 'ভরত' নামান্তরে গণ্য হ'তেন। সম্প্রদায় লুপ্ত হলেও, সম্প্রদায়-প্রবর্তকের নাম নানারকমে থেকে যায়। যেমন, চরক-সম্প্রদায়, নাথ-সম্প্রদায়।

৭। নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের রচনা-পদ্ধতি অনুধাবন করলেই বুঝা যায় ভরত মুনি কখনও

অবিকল এইরূপ গ্রথিত পদ্য-বাক্যে উপদেশ করেন নি। রচনা সূত্র-ভাষ্যাকারিত, এবং যোগ্য অর্থ উদ্ধার পক্ষে অধিকাংশ শ্লোকই দুরূহ। ভরত মুনির সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গ সকলেই শ্রুতিধর মেধাবী ও ইঙ্গিতগ্রাহী ছিলেন, এ রকম কল্পনা-গৌরব দিয়ে লাভ হবে না। অতএব,—আনুমানিক সিদ্ধান্ত হয় যে, ভরত-মুনির নিজ মুখে কথিত উপদেশগুলি পরিপাটিরূপে রক্ষা করার চেষ্টায়, **সমগ্র উপদেশাবলী সুবিভক্ত দু'টি সংগ্রহের রূপে সর্বপ্রথমে বিরচিত হয়েছিল।** এই সংগ্রহ-বিরচন ভরত মুনির সাক্ষাতে, ও সাহায্যেও সম্পাদিত হয়েছিল এমন মনে করতে কল্পনার প্রয়োজন হয় না। দু'টি সংগ্রহের নাম ছিল, 'নাট্য-সংগ্রহ' ও 'গান্ধর্ব-সংগ্রহ'। এবং যেহেতু সমগ্ররূপ পরিকল্পনার মধ্যে পরস্পরাশ্রয়ী একত্ব ছিল, অতএব সেই বিরচনার নাম ছিল 'সংগ্রহ-শাস্ত্র'। বস্তুত, "বৃহদ্দেশী" * নামে ভরতোত্তরকালের সঙ্গীত-গ্রন্থে এই নামটিই উদ্ধৃত হয়েছে; নাট্য-শাস্ত্র নাম নয়।

সংগ্রহ-শাস্ত্র বিরচনা করেছিলেন ভরত-শিষ্যগণ। কিন্তু, রচনার মধ্যে ভরতের নাম ও উত্তমপুরুষ ঘটিত বাক্য যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সূচক রূপে থেকে গেল। এই রকমই ত' হওয়া উচিত। মূল বক্তা বা উপদেষ্টাকে অনুল্লেখ দিয়ে অসম্মান করার মতো মতি-প্রবৃত্তি তখন দেখা দেয়নি।

এইভাবে ঘটেছিল প্রাথমিক সম্পাদনা; নাম ছিল সংগ্রহশাস্ত্র; নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যেই এর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হ'ত বলে, ঐ সংক্ষিপ্ত নামই ছিল যথেষ্ট। বলাই বাহুল্য, তখন পর্যন্ত 'নাট্যশাস্ত্রম' নামে গ্রন্থের প্রথমাবধি পঞ্চম অধ্যায় এবং ৩৫শ অধ্যায় বিরচিত হয়নি। এই শেষোক্ত পক্ষে প্রথমপুরুষ ঘটিত বাক্যরচনাই প্রমাণ; অন্য প্রমাণও আছে।

যেসকল সাম্প্রদায়িক শিষ্যগণ সংগ্রহ-শাস্ত্রের প্রাথমিক সম্পাদনা করেছিলেন, তাঁদের নাম-পরিচয় অজ্ঞাত হ'লেও তাঁদেরকে আমি "প্রাথমিক সম্পাদকবর্গ" নামে অভিহিত করব।

এই মৌলিক সম্পাদনা অবশ্যই লিপিগত ছিল। **তবে, এর অতিরিক্ত, এমনও অসম্পাদিত ও শ্রুতিমাত্র সিদ্ধ সাম্প্রদায়িক উপদেশ-বচন ছিল,** যার কিয়ৎ-কিঞ্চিৎ অংশ 'ভরত-বচন' বা 'মুনি-বচন' রূপে "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থে দেখা দেয়।

যে কোন সিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় পক্ষে বলা যায় যে, অন্তত সাম্প্রদায়িক আচার্য-উপাধ্যায়বর্গ মূল পাণ্ডুলিপি বা তার অনুলিপিকে সর্বদোষমুক্ত করে রক্ষা করতেন, পঠন-পাঠনের স্মারক-সহায়ক মনে করে সমাদর করতেন। সুতরাং মনে করতে পারি যতদিন নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায় অক্ষুণ্ন ছিল, এবং আচার্য-প্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, ততকাল পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিতে ভ্রম-প্রমাদ উৎক্ষেপ ও প্রক্ষেপ আবির্ভূত হয়নি। **উৎপেক্ষ** অর্থাৎ একস্থানের শ্লোক বা বাক্য অন্য অসঙ্গত স্থানে উৎক্ষেপিত ও বিন্যস্ত হওয়া। **প্রক্ষেপ** সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে সংগ্রহ-শাস্ত্রের মূল করণ ও করণ-বিধি অব্যাহত রক্ষা করে, প্রয়োজনবশে, অভিনব শ্লোক বা বাক্য যোজিত হ'লে তাকে **নির্দোষ প্রক্ষেপ** বলি। নির্দোষ প্রক্ষেপের কারণে শাস্ত্রের স্বরূপ বিকৃত না হয়েও কলেবর বৃদ্ধি হ'তে পারে। এরকম বৃদ্ধি যে দোষাবহ নয়, তার প্রমাণ "দেশী" ও "বৃহদ্দেশী" নামের মধ্যেই রয়েছে। "বৃহজ্জাতক" "বৃহৎপরাশর" প্রভৃতি গ্রন্থ নামগুলি মূলগ্রন্থে প্রক্ষেপ জন্য কলেবর বৃদ্ধির সূচক।* যাই হ'ক, ভারতীয় সংস্কারের দৃষ্টিতে **নির্দোষ প্রক্ষেপই "প্রক্ষেপ" নামের যোগ্য;** যেমন চরকাদি প্রবর্তিত আয়ুর্বেদের ঔষধ-প্রস্তুত ব্যাপারে অমুক অমুক

"The Bṛhaddesî, of Matangamuni"; edited by K. Sâmbasiva Sâstri, Curator of the Department for the publication of Sanskrit Manuscripts, Trivandrum. Printed by the Superintendent, Government Press, 1928.

* আধুনিক কালে ইংরাজি ভাষায় রচিত "গ্রেজ্ অ্যানাটমি" নামে অতুলনীয় দেহ-বিজ্ঞানগ্রন্থ

বস্তুর প্রক্ষেপ। আমি ভ্রম-প্রমাদ বলতে লিপিকারের অনবধানতা মনে করি; **উৎক্ষেপ দোষকে সম্পাদনার দোষ মনে করি। এবং সদোষ প্রক্ষেপকে সম্পাদনার অবহেলা মনে করি।** যে প্রক্ষেপ মূলকরণ বা বিধির পক্ষে। সিদ্ধান্ত বিরোধের সৃষ্টি করে, **সেই প্রক্ষেপই সদোষ প্রক্ষেপ।**

নাট্যশাস্ত্রের দুই সংস্করণেই উক্ত চার রকমের দোষ আছে; অধিকন্তু, প্রত্যাশিত, সঙ্গতি-ক্রমিক শ্লোকাংশ, শ্লোক, বাক্য এমনকি কারিকার লোপও আবিষ্কার করা যায়। শিল্প-বিজ্ঞান শাস্ত্রে এ রকমের দোষ অনুশীলন-চেষ্টাকে বিব্রত, বিড়ম্বিত করে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

যাই হ'ক, প্রাথমিক সম্পাদনা প্রসূত পাণ্ডুলিপি, অন্তত একখানি পাণ্ডুলিপি যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষবর্জিত ছিল, এরকম অনুমান ও সিদ্ধান্ত কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না।

ঐ প্রাথমিক সম্পাদনা প্রসূত অংশকে সাম্প্রদায়িক বৃক্ষের শাখা-পল্লবযুক্ত কাণ্ড মনে করেছি। এই প্রধান অংশই যে ধীরভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলনের যোগ্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, এই অংশই হ'ল ভরত-মুখনিঃসৃত নাট্য-গান্ধর্বোপদেশের প্রতিচ্ছবি ও প্রতিনিধি।

ইতিপূর্বে বলেছি, **কিছু অসম্পাদিত উপদেশাংশ শ্রুতিস্মৃতি রূপে বর্তিত হয়ে থাকবে।** অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে **নাট্যশাস্ত্রের ছায়া-ভূমিক অংশে অসম্পাদিত অংশের কিছু ঐতিহ্য প্রকীর্ণ বস্তু রূপে আশ্রয় লাভ করেছে।** অধিকন্তু দেখা যায়, **নাট্য-গান্ধর্বসংগ্রহের কিছু কিছু শাখা-পত্র-পল্লব স্বস্থানচ্যুত হয়ে ছায়া-ভূমিক অংশে পতিত রয়েছে।** পরিশেষে দেখা যায়, ছায়া-ভূমিক অংশে এমন অনেক **বস্তু সংগৃহীত হয়েছে, যেগুলি বহিরাগত পরতন্ত্র সিদ্ধান্ত।** নাট্য-গান্ধর্ব সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য ও বক্তব্যের সঙ্গে এগুলির সিদ্ধান্ত বিরোধ দেখা যায়।

৮। প্রচলিত নাট্যশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকে ৩৫শ অধ্যায় (কা-সং ৩৬ অধ্যায়) পর্যন্ত অংশকে **মূল সংগ্রহশাস্ত্রের** প্রতিচ্ছবিরূপে স্বীকার করা যাক।

পরিবেশিত বিষয়গুলি সাধারণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে দেখা যায়, যাবতীয় বিধি-বক্তব্য উত্তম-পুরুষ ঘটিত বাক্যে ভরত মুনিকেই মূল বক্তা রূপে সূচিত করে। এর মধ্যে "**বক্ষ্যামি**" ও "**বক্ষ্যামঃ**" দু'রকম প্রয়োগ আছে। অবশ্য, মীমাংসারূপে বলা যায় যে ভরত মুনির কিছু উপদেশ তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত মত রূপে ব্যক্ত হয়ে থাকবে; সে স্থলে "বক্ষ্যামি" কিছু দোষাবহ নয়। আবার, অন্য অনেক উপদেশ-নির্দেশও ছিল, যেগুলিকে ভরত মুনি পূর্বাচার্যবর্গের মুখাগত সিদ্ধান্ত রূপে অনুবাদ করেছিলেন; এ স্থলে "বক্ষ্যামঃ" প্রয়োগই উচিত।

এই অংশের মধ্যে ইতিবৃত্ত বা কথাকাহিনীর অবতারণা অতি অল্পই দেখা যায়। ৩০শটি অধ্যায় ও ৪৬০৬টি শ্লোক দিয়ে গ্রথিত (কা-সং ৩১ টি অধ্যায় ও ৪৩৪৯ শ্লোক) এই অংশে বৃত্তিবিকল্প নামে ২২শ অধ্যায়ে ভগবান অচ্যুত ও মধুকৈটভাসুরদ্বয়ের যুদ্ধ কাহিনীর উল্লেখ আছে। তাল-ব্যঞ্জক নামে ৩১শ অধ্যায়ে রুদ্র কর্তৃক দানব-নিধনের পরেই চিত্র-তাণ্ডব সংজ্ঞিত নৃত্তের (নৃত্যের নয়) উৎপত্তির কাহিনী আছে। এবং বাদ্যাধ্যায় নামে ৩৩শ অধ্যায়ে জনৈক 'স্বাতি' মুনির কোনও জলাশয়ে গমনান্তর মৃদঙ্গ ধ্বনির নিদর্শন আবিষ্কারের কাহিনী আছে।

মুনি-ভরত সংলাপ সূচক উল্লেখ আছে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে, এবং ৮ম অধ্যায়ের প্রারম্ভে; মাত্র দুই স্থানে।

প্রসঙ্গত, **সংগ্রহাতিরিক্ত ছায়া-ভূমিক অংশ** সর্বশুদ্ধ ৯৫০ শ্লোক ও ছয়টি মাত্র অধ্যায়ে

নির্দোষ প্রক্ষেপ ও গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধির সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ মনে করি। এর মূল গ্রন্থটি আধুনিক আয়তনের এক দশমাংশ ছিল কিনা সন্দেহ! পরম্পরা চেষ্টিত সম্পাদনার উল্লেখ ও ইতিহাস আধুনিক গ্রন্থে আছে।

বিরচিত। প্রথম পুরুষ ঘটিত বর্ণনা পদ্ধতিই সাধারণভাবে দ্রষ্টব্য। **প্রচুর ও বিভিন্ন রকমের সংলাপ আছে,** যথা ব্রহ্মা-দেবগণ সংলাপ, ব্রহ্মা-ইন্দ্র সংলাপ, ব্রহ্মা-ভরত সংলাপ, মুনিগণ-ভরত সংলাপ। প্রত্যেকটি সংলাপের সঙ্গে ইতর-বিশেষ কাহিনীও জড়িত। মহেশ্বর-ভরত সংলাপ আছে অঙ্গহার-নৃত্ত-নৃত্যের উৎপত্তি কাহিনীর সঙ্গে জড়িত হয়ে।

কা-সংস্করণের এই অংশ সর্বশুদ্ধ ৯৬৫ শ্লোক ও সাতটি (?) অধ্যায়ে বিরচিত। সংলাপ-কাহিনী প্রভৃতি চৌ-সংস্করণের অনুরূপ অংশের তুল্য।

চৌ-সংস্করণের সংগ্রহাতিরিক্ত অংশে গুহ্য বিকল্পনামে সপ্তত্রিংশঃ অধ্যায় নেই। এবং সমগ্র গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক "সমাপ্তশ্চায়ং (গ্রন্থঃ) নন্দিভরতসঙ্গীতপুস্তকম্" ইতি পাঠ নেই। এই দুই উল্লেখ মাত্র কা-সংস্করণের গ্রন্থবৈশিষ্ট্য রূপে গণ্য।

(৯) দুই সংস্করণের প্রধান অর্থাৎ কান্ড-পল্লব অংশে "নাট্যশাস্ত্র" শব্দের উল্লেখ নেই। অথচ, দুই সংস্করণের ছায়া-ভূমিক অংশের আদিতেই মঙ্গলাচরণ শ্লোকের মধ্যে "নাট্যশাস্ত্র" শব্দটি ব্যবহৃত। যথা— প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহমহেশ্বরৌ।

নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম * ॥ ১ ॥

এস্থলে "প্রবক্ষ্যামি" উত্তমপুরুষ ঘটিত প্রয়োগ দেখেই অনুমান হয়, বাক্যটি প্রাথমিক সম্পাদনার কালেও অবিকল এইরূপ ছিল। কিন্তু আপত্তিও উপস্থিত হয়।

বস্তুত, ৬ষ্ঠ অধ্যায় প্রারম্ভ থেকে "সংগ্রহ" রচনার প্রসঙ্গ আরম্ভ হল। কিন্তু নাট্যশাস্ত্র **প্রসঙ্গ নয়।** প্রারম্ভিক অংশ উদ্ধারণীয়, যথা ঃ—অথ ষষ্ঠাধ্যায় প্রারম্ভঃ

পূর্বরঙ্গবিধিং শ্রুত্বা পুনরাহুর্মহত্তমাঃ।
মুনয়োর্ভরতং সর্বে পঞ্চ প্রশ্নান্ ব্রবীহিনঃ ॥ ১ ॥

অর্থতঃ ঃ—(৬ষ্ঠাধ্যায়ের পূর্বে যে অংশ, সেই অংশের পূর্বে ঐতিহ্য বশে) পূর্বরঙ্গ বিধি শ্রবণ করার পরে মহত্তম মুনিগণ সকলে (মিলে) পুনরায় ভরতকে বলিলেন "সম্প্রতি পাঁচটি বিষয়ের" প্রশ্নের (মীমাংসাকল্পে) আমাদিগকে উপদেশ করুন।"

অতঃপর ঃ যে **রসা** ইতি পঠ্যন্তে নাট্যে নাট্যবিচক্ষণৈঃ।
রসত্বং কেন বা তেষাং এতদাখ্যাতুমর্হসি ॥২॥
ভাবাশ্চৈব হি যে প্রোক্তা কিংবা তে ভাবয়ন্তি হি।
সংগ্রহং কারিকা চৈব **নিরুক্তং** চৈবতত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥
তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা মুনীনাং ভরতো মুনিঃ।
প্রত্যুবাচ পুনর্বাক্যং রসভাববিকল্পনম্ ॥৪॥

অর্থতঃ—নাট্যে (নাট্য বিষয়ে) নাট্য বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যে রস (পদার্থ) সকল বর্ণনা করেন সেই রসগুলির রসত্ব কিরূপ প্রমাণদ্বারা অবধারিত হয়, এরূপ কথা আপনার ব্যাখ্যা করা উচিত। অধিকন্তু, যেসকল ভাব পদার্থে বলা হয়েছে, সেগুলি কোন পদার্থকে বিভাবিত করে? এবং সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্ত বিষয়ে (আপনি) তত্ত্ব উদ্ঘাটন পূর্বক প্রশ্নের মীমাংসা করুন। সেই মুনিগণের বাক্য শ্রবণানন্তর ভরত মুনি প্রতিবাক্যে পুনরায় রস-ভাব বিকল্পনা (বিষয়ে) উপদেশ করিয়াছিলেন।

এই অংশটি যথার্থ নাট্য সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত নয়। নাট্য সংগ্রহের অংশ যথা—রস, ভাব, অভিনয়, ধর্মীবৃত্তিপ্রবৃত্তি সকল, সিদ্ধি স্বর সকল, আতোদ্য গান ও দুই প্রকার রঙ্গ *।

* "যদুদীরিতম্" পাঠান্তরও গবেষকবর্গ লক্ষ্য করেছেন

*৬ ষ্ঠ অধ্যায় ১০ম শ্লোক

কারিকা নিরুক্ত ও সংগ্রহ বিষয়ে নাট্যসংগ্রহে সংজ্ঞা-লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে যাইহ'ক, সমগ্র ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ভরত মুনি 'নাট্যশাস্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করেননি। ঐ শব্দটি ভরত মুখে বা প্রাথমিক সম্পাদনার কালে শ্রৌত রূপে ব্যবহৃত হলে, নাট্যশাস্ত্রের এই অংশ বা অন্য কোনও অংশে ঐ শব্দটির প্রয়োগ দেখা দিত।

এই হেতুতেই অনুমান করা যায়, ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম থেকে ৪র্থ শ্লোক প্রাথমিক সম্পাদনার অঙ্গীভূত ছিল না। এই সংলাপ-প্রস্তাবনা যে কালে প্রাথমিক সম্পাদনার সঙ্গে যোজিত করা হয়েছিল, সেকালে নাট্য ছিলনা, বা অন্য অনামিক নাট্যশাস্ত্র ছিল না, এরূপ সম্ভাবনার বাধা নেই, অবশ্য।

এখন, মঙ্গলাচরণের অন্তর্গত 'নাট্যশাস্ত্র' শব্দের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়। এই মঙ্গলাচরণ বাক্যটি প্রাথমিক সম্পাদনার সময়ে ছিল না; অথবা; অবিকল এইরূপ ছিল না।

'বক্ষ্যামি' প্রয়োগদ্বারা মনে হয় কোনও পরবর্তীকালের আচার্য এই শ্লোকটি রচনা করে সর্বপ্রথমে বিন্যস্ত করেছিলেন। ফল কথা, ব্রহ্মা চতুর্বেদ থেকে নাট্য বেদই (নাট্যশাস্ত্র নয়) উদাহৃত করেছিলেন, এই কথাই গল্পাকারে নাট্যশাস্ত্রের ১ম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। অন্য কোথাও "নাট্যশাস্ত্র" শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। এমন কি ছায়া-ভূমিক ৩৬ শ অধ্যায়েও মুনিগণের মুখে কথা বলা হয়েছে, যথা ঃ—

যস্ত্বয়া কথিতো হ্যেষ **নাট্যবেদঃ** পুরাতনঃ।
একচিত্তৈঃ সহাস্মাভিঃ সম্যক সমুপধারিতঃ ॥৭॥

এই সমস্ত যুক্তি ও বিচার দিয়ে মনে হয়, আচার্যকৃত মঙ্গলাচরণ বাক্যটির সম্ভব রূপ ছিল, প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহ মহেশ্বরৌ।
নাট্যোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম ॥

বস্তুত, প্রথম অধ্যায়ের বিষয় ও নাম হল নাট্যোৎপত্তির ইতিকথা। যাই হ'ক,—ভ্রম-প্রমাদ বশে 'নাট্যোৎপত্তি' শব্দ "নাট্যশাস্ত্র" শব্দে পাঠান্তরিত হয়েছিল।

তাহ'লেও, **প্রাথমিক সম্পাদনার কালে ঐ মঙ্গলাচরণ ছিলনা। অন্য কোন মঙ্গলাচরণ বাক্য ছিল, যা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।**

(১০) নাট্যশাস্ত্রের কেন্দ্রীভূত কান্ড-পল্লব অংশের প্রাথমিক সম্পাদনার কালে "নাট্যশাস্ত্র" নাম কল্পিত হয়নি। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করলে প্রশ্ন হয়—তাহলে "নাট্যশাস্ত্র" নাম কল্পনা কবে থেকে হয়েছিল, এবং প্রয়োজনই বা কি ছিল?

এর উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায় যে, পরবর্তী কোনও কালে নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের আচার্য প্রণালীর লোপ ঘটেছিল; যোগ্য কর্ণধারহীন তরীর মতো নাট্য-গান্ধর্বের শিক্ষা-শিক্ষণ বিদ্যার অবনতি ঘটেছিল, নাট্য-গান্ধর্ব প্রয়োগের মধ্যে উন্মার্গগামী উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করেছিল, সংগ্রহ-শাস্ত্র কান্ড-পল্লবসমেত অবহেলিত বৃক্ষের মতো পঠন-পাঠন-অনুশীলন বর্জিত হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে নাট্য-গান্ধর্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার কল্পে একটি চেষ্টা হয়েছিল। সেই চেষ্টার ফলেই 'সংগ্রহ' কান্ড-পল্লবের সঙ্গে অতিরিক্ত অংশ যোজনা করে, **সমগ্র বিরচনাকে 'নাট্য-শাস্ত্র' নামে অভিনব আকৃতি ও রূপ দান করা হয়েছিল।**

এসমস্ত বিষয়ে বিশদ আলোচনার পূর্বে দুইটি কথা স্মরণ যোগ্য। প্রথম নাট্য-সংগ্রহেরই অধিকৃত, "সন্ধ্যঙ্গবিকল্প" নামে ১১শ অধ্যায়ের শেষের দিকে নাট্যযোগ্য ইতিবৃত্ত (নাটকের গল্পাংশ) ও সন্ধিস্থান যোজনার নিয়ম প্রভৃতি উপদেশ করার পরে একটি সাবধান-বাণী উপদিষ্ট হয়েছে; যথা ঃ—

ভবিষ্যতি যুগে প্রায়ো ভবিষ্যন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ নরাঃ।
যে চাহাপিহি ভবিষ্যন্তি তেহতাল্পশ্রুতবুদ্ধয়ঃ ॥১২৯॥
বুদ্ধয়ঃ কর্মশিল্পানি বৈচক্ষণ্যং কলাস্তু চ।
সর্বাণি পুংসাং নশ্যন্তি যদা লোকঃ প্রণশ্যতি ॥ ১৩০ ॥
তদেব লোকভাবানাং প্রসমীক্ষ্য বলাবলম্।
মৃদ্বশব্দং সুখার্থং চ কবিঃ কুর্যাত্তু নাটকম্ ॥১৩১॥
চেষ্টাক্রীড়াদ্যৈঃ শব্দৈস্তু কাব্যবন্ধা ভবন্তি যে।
বেশ্যা ইব ন শোভন্তে কমণ্ডলুধরৈর্দ্বিজৈঃ ॥

এর ভাবার্থ যথা ঃ—আগামী যুগে মনুষ্যগণ প্রায়ই অল্পবুদ্ধি হবে অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হবে। যদি বা হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্য দেখা দেয়, তাহলেও তারা অত্যল্পশ্রুত (শাস্ত্র বাক্য বিষয়ে শ্রবণাভিনিবেশে হীনশক্তি বা মতিহীন) এবং অত্যল্পবুদ্ধি (অত্যল্প অধ্যবসায়ী) হবে। যদি এইভাবে লোক (লোকাদশ'ই) নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে, সমস্ত বুদ্ধি, কর্ম (অনুষ্ঠেয় কর্ম) শিল্পসকল এবং কলা-বৈচক্ষণ্যও নষ্ট হয়ে যাবে। **অতএব, কবি (অর্থাৎ নাটকের ইতিবৃত্তাদির রচয়িতা)** লোকভাব সকলের (লোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ রুচি, মতি ও উত্তম আদর্শের গ্রহণের শক্তি) বলাবল বুঝে **নাটক রচনাকে** মৃদু (অকঠিন, সুখব্যাব্য) শব্দ (রচনা) দিয়ে এবং অন্যায়স গ্রাহ্য অর্থবান শব্দ দিয়ে প্রস্তুত করবেন (নচেৎ, অল্পবুদ্ধি ইত্যাদি জনগণ নাটকের প্রভাব গ্রহণ করতে পারবে না)। নাটকের শোভা ও প্রভাবসৃষ্টির জন্যই কাব্যবন্ধ রচনায় ধ্রুবাগীতি প্রযোজ্য। **এই কাব্যবন্ধ রচনাগুলি ক্রীড়া-কৌতুকমোদী শব্দে রচনা** করলে, কমণ্ডলুধারী (ব্রতনিষ্ঠ) ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে বেশ্যাজনের সহোপবেশনের মতো অসঙ্গত বা অশোভনীয় হবে।

এস্থলে **প্রসঙ্গ হ'ল** অবশ্য নাট্যোপযোগী দশরকম রচনার (দশরূপ) মধ্যে **সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমুন্নততম "নাটক" রচনা। কাব্যের মধ্যে যেমন মহাকাব্য, রূপকরচনার মধ্যে সে রকম "নাটক"।** নাটকের সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিবৃত্ত-দেহ এবং নাট্যের উত্তমপ্রয়োগকর্ম মিলিত হ'লে জড়বুদ্ধি প্রেক্ষকেরও বুদ্ধির আবরণ মুক্ত হয়ে যায়।

যাই হ'ক,—ভবিষ্যৎ- বাণীই আপাতত স্মরণীয় প্রসঙ্গ। ভরত মুনি ভবিষ্যৎ বাণী দিয়ে বললেন, ক্রমশ লোকের হিতাহিত জ্ঞান ক্ষীণতর হ'তে থাকবে, ইত্যাদি। ভরত মুনি কি দৈবজ্ঞ, নাকি, স্বপ্নাদিষ্ট জ্ঞানী? তা নয়। তিনি প্রজ্ঞাবান পুরুষ ছিলেন। তাৎপর্য এই যে, সমাজে লোকসংখ্যা বাড়বে, জীবনযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী রূপে কঠিনতর ও ভয়ানকতর হ'তে বাধ্য। এরই তাড়নায় লোকের হিতাহিত জ্ঞান ক্রমশ ক্ষীয়মান হ'তে বাধ্য।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ আছে, ৩৫শ অধ্যায়ে মুনি-ভরত সংলাপের আকারে। কিছু প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন হ'ল ভরত-প্রবর্তিত মহান্ নাট্যসম্প্রদায়ের আশ্রিত "ভরত" অর্থাৎ নাট্যশিল্পীগণ কিহেতু "নট-নটী" অমর্যাদাকর নামে অভিহিত হ'লেন। এর উত্তরে **ভরতমুনি একটি অভিশাপের গল্প বলেছেন।** বলাই বাহুল্য, এই অংশটি প্রাথমিক সম্পাদনার অংশ নয়। তাহ'লেও এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রয়েছে। প্রসঙ্গত, **চৌ-সংস্করণে এই অধ্যায় অংশের নাম "নাট্যাবতার";** অর্থাৎ নাট্যকর্ম পূর্বে দিব্যলোকে ছিল, পরে মর্তে অবতীর্ণ হয়ে মানুষী প্রতিষ্ঠার রূপ ধারণ করেছিল। **কা-সংস্করণের এই অংশের নাম "নটশাপ"।**

এই দুটি প্রসঙ্গের মর্ম এই যে—কালে লোকসমাজের অবনতি হওয়া যেমন দুরতিক্রমণীয়, সেরকম নাট্যশিল্প ও সম্প্রদায়ের অবনতি নিতান্তই দৈবাধীন।

অতঃপর "নট্যশাস্ত্র" নাম প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক।

প্রাথমিক সম্পাদনার পরে বহুকাল পর্যন্ত নাট্য-গান্ধর্ব বিষয়ে সম্প্রদায়-সিদ্ধি ও কর্ম-সিদ্ধি প্রবর্তিত ছিল। **শেষে এক সময় থেকে, আচার্য-লোপ ও অবনতি আরম্ভ হ'ল।** অবনতির সময়ে সংগ্রহ-শাস্ত্রের সংহতি ও মর্যাদা বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম ঘটলে, **দ্বিতীয় বা মাধ্যমিক সম্পাদনা** আরম্ভ হয়েছিল।

অনুমান হয়, আচার্যলোপের কারণে **এই সময়ে** "সংগ্রহ"-শাস্ত্রের পাণ্ডুলিপি বা পরম্পরাকারিত অনুলিপির মধ্যে কিছু পাঠান্তর, কিছু উৎক্ষেপ, কিছু প্রক্ষেপ, এবং কিছু বিষয়চ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। **মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ** যথাসাধ্য চেষ্টা করে অধ্যায়গুলি যথাবিন্যস্ত করেছিলেন। **অধিকন্তু যুগোচিত প্রয়োজন বোধে, মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ** সংগ্রহ-শাস্ত্রে অনুল্লিখিত কিছু ঐতিহ্য-কিম্বদন্তী আহরণ করে, সমগ্রত গ্রন্থ সংকলন করলেন "ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রম্" নামে। তখন থেকে 'সংগ্রহ' বা 'সংগ্রহ-শাস্ত্র' নাম অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। মাধ্যমিক সম্পাদক বর্গ যে "ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রম্" নাম দিয়েছিলেন (মাত্র "নাট্যশাস্ত্রম্" নয়) তার প্রমাণ রয়েছে, প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তির পর বাক্যের মধ্যে যথা 'ইতি ভারতীয়ে নাট্যশাস্ত্রে .. অমুক নাম অমুকোঽধ্যায়ঃ।"

এই **"ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রম্"** (শ্রী বর্জিত) এবং কা-সংস্করণে **"শ্রীভারতীয় নাট্যশাস্ত্রম্"** (শ্রীযুক্ত) পাঠ ও পাঠভেদ দৃষ্টে অনুমান হয় মাধ্যমিক সম্পাদনার যুগে অন্য নাট্যশাস্ত্রও উদ্ভূত হয়েছিল; বিশেষণে সবিশেষ্যথেই মাধ্যমিক সম্পাদনার নামের পূর্বে "ভারতীয়" যোগ করা হয়েছিল। সেই অপর নাট্যশাস্ত্রগুলি লুপ্ত হয়েগেলে, মাত্র "নাট্যশাস্ত্রম্" বললেই বিবুধজনেরা" "ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রম্" বুঝে নিতেন। দ্বিতীয় দৃষ্টব্য এই যে— **প্রাথমিক সম্পাদনার যুগে আচার্য বা সিদ্ধপুরুষ প্রবর্তিত সাম্প্রদায়িক মর্যাদা অর্থে গ্রন্থ নামের পূর্বে "শ্রী" প্রয়োগ বিহিত হয়নি।** কা-সংস্করণের কয়েকটি অধ্যায় শেষে সমাপ্তি সূচক বাক্যের মধ্যে "শ্রী" প্রয়োগ, এবং অন্য কয়েকটিতে "শ্রী"র অভাব দেখে মনে হয়,—সাধারণ ভাবে **কা-সংস্করণের মূল পাণ্ডুলিপি চৌ-সংস্করণের মূল পাণ্ডুলিপি থেকে অর্বাচীনতর।** পাণ্ডুলিপির কলেবরের **বৃহৎ-ক্ষুদ্রতরত্ব থেকে অর্বাচীন-প্রাচীনতরত্ব অনুমান অন্য কারণ নিরপেক্ষ ভাবে অসঙ্গত মনে করি।** একমাত্র সাহিত্যিক গবেষক ব্যক্তিই বলতে পারেন, সরকারী ইতিহাসের কোন যুগ পর্যন্ত "শ্রী" যোজনা বিহিত হয়নি, কোনযুগ থেকেই বা ঐ শিষ্টাচার * প্রচলিত হয়েছিল। এই তথ্যটি অন্তরূপে নির্ধারিত হ'লে চৌ-সংস্করণের মূল পাণ্ডুলিপির পশ্চিমতম সীমা এবং কা-সংস্করণের মূল পাণ্ডুলিপির পূর্বতম সীমা অনুমান করা সম্ভব হবে।

সরকারী ইতিহাসগত কাল নির্ণয় সম্ভব না হ'লেও আপেক্ষিকভাবে মাধ্যমিক সম্পাদনার কালনির্ণয় হয়ত সম্ভব।

প্রথমত, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক কোনও সম্পাদনায় "শ্রীভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে" বাক্য দেখা যায় না। অধ্যায়ের শেষে ভরতমুনির নাম গ্রহণে "শ্রী" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় কা-সংস্করণের পাঠে। অতএব সংস্করণ দুটির মধ্যে চৌ-সং পাণ্ডুলিপিই প্রাচীনতর।

দ্বিতীয় কথা এই যে, —মতঙ্গপ্রণীত "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থে ও বাল্মীকি রামায়ণে ভরতের উল্লেখ থেকে মনে হয়না ভরতমুনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ত্রিলোকচারী সিদ্ধ পুরুষরূপে গণ্য

* প্রকৃতিবাদ অভিধানে 'শ্রী' শব্দের অধিকারে উদ্ধৃত বাক্য যথা, "দেবাদিনান্দঃ পূর্বং শ্রীশব্দ প্রয়োগঃ কর্তব্যঃ।" এবং একটি শ্লোক যথা,

দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাম্।
সিদ্ধং সিদ্ধাধিকারাংশ্চ শ্রীপূর্বং সমুদীরয়েৎ।।

হয়েছেন। বৃহদ্দেশী প্রণেতা মতঙ্গ ও রামায়ণে উল্লিখিত মতঙ্গমুনি যে একই ব্যক্তি, এরকম মনে করার কারণ আছে। এককথায়, মতঙ্গমুনি রামায়নী ঘটনার সমসাময়িক মনে হয়।

নাট্যশাস্ত্রের ১ম অধ্যায় এবং ৩৬শ অধ্যায় পাঠে মনে হয় ভরত মুনি সিদ্ধমন্য হয়েছেন; কারণ অনায়াসে স্বর্গে গিয়ে ব্রহ্মা ইন্দ্র ও অপ্সরোগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, এবং তাদের সঙ্গে কথোপকথনও করেছিলেন। ৪র্থ অধ্যায়ের মধ্যে ব্রহ্মাসমভিব্যাহারে ভরত মুনির মহাদেব সকাশে গমনের বৃত্তান্তও আছে।

অতএব, অনুমান করতে পারি, এমন একটি কালে মাধ্যমিক সম্পাদনা ও নাট্যশাস্ত্র নামকরণ হয়েছিল, যা 'বৃহদ্দেশী' রচনা ও রামায়নী ঘটনার পরবর্তী।

মহাভারতের মধ্যে ভরতের উল্লেখ আছে। গান্ধর্বের উল্লেখ আছে। ভরতমুনি নারদবর্ণিত বহু স্বর্গীয় সভার মধ্যে বিশেষ একটি সভায় আহূত হয়েছিলেন ও গীতবাদ্যনৃত্তাদি উপভোগ করেছিলেন। সুতরাং অনুমান হয় মহাভারতে উল্লিখিত ভরত সিদ্ধমন্য হয়েছেন।

অতএব, সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়, 'নাট্যশাস্ত্র' নামিক মাধ্যমিক সম্পাদনা বৃহদ্দেশী-রামায়ণের ও মহাভারতের রচনার মধ্যবর্তী কোনও কালে প্রবর্তিত হয়েছিল।

প্রাথমিক সম্পাদনার কাল সম্বন্ধে কিছু বিশেষ কথা আছে।

কবি অশ্ব ঘোষ প্রণীত **"বুদ্ধচরিত"** নামে অপূর্ব কাব্যের * মধ্যে শ্রীবুদ্ধদেবের স্বগৃহ থেকে নিষ্ক্রমণ বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আছে। এই অংশের বিশিষ্ট শ্লোকচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রসুপ্ত সহচরীবর্গের বিচিত্র ভাবে বিপর্যস্ত শয়নের ভঙ্গিমা বিবৃত হয়েছে; মনে হয়, এর তুলনা নেই। কিন্তু, কয়েকটি শব্দের ক্রমপরম্পরা ভাবে প্রয়োগ লক্ষ্য করলে সদ্য অনুমান হয় ইঙ্গিতগুলি ইচ্ছাকৃত। নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায়ে "আতোদ্য" অর্থাৎ বীণাদি চার রকমের বাদ্যযন্ত্র যেরূপ বিবৃত হয়েছে, মনে হয় **অশ্বঘোষ সেই আতোদ্যগুলির ইঙ্গিত করেছেন**। বলাই বাহুল্য, অন্য কোনও স্থানে এরকম পরম্পরাকৃত সংকেত বা উল্লেখ পাওয়া যায়না। অর্থাৎ, একসঙ্গেও পরম্পরায় "বীণা" "মৃদঙ্গ" "বংশ" ও "ঘন" নামে বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়না। এবং নাট্যশাস্ত্র থেকে প্রাচীনতর এমন কোনও সঙ্গীতশাস্ত্র বা অন্য শ্রেণীর গ্রন্থও পাওয়া যায় না, যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বদৃষ্টির অনুগতভাবে, অথবা লৌকিক সহজজ্ঞানের অনুগতভাবে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রকে সাধারণভাবে আতোদ্য (আ=ঈষৎ, তুদ্ ধাতু পীড়ন বা নিগ্রহার্থে) অভিহিত করা হয়েছে, এবং বিশেষ ভাবে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে যথাযথ নামকরণও হয়েছে।

---

* ই এইচ্, জন্সন সম্পাদিত "বুদ্ধচরিত।" পঞ্চমসর্গ ৫১ পৃষ্ঠায় শ্লোক যথা—

অভবচ্ছয়িতা হি তত্র কাচিদ্বিনিবেশ্য প্রচলে করে কপোলম ॥
দয়িতামপি রুক্মপত্রচিত্রাং কুপিতেবাঙ্কগতাং বিহায় **বীণাম্** ॥ ৪৮ শ্লোক ॥
বিবভৌ করলগ্ন **বেণুরন্যা** স্তনবিস্রস্তসিতাংশুকা শয়ানা।
ঋজুষট্পদপঙ্ক্তিজুষ্টপদ্মা জলফেনপ্রহসত্তটা নদীব ॥ ৪৯ ॥
নব**পুষ্কর**গর্ভকোমলাভ্যাং তপনীয়োজ্জ্বলসঙ্গতাঙ্গদাভ্যাম্।
স্বপিতিস্মতথাপরা ভুজাভ্যাং পরিরভ্য প্রিয়ব**ন্মৃদঙ্গ** এব ॥ ৫০ ॥
নবহাটকভূষণাস্তথান্যা বসনং পীতমনুত্তমং বসানাঃ।
অবশা **ঘন**নিদ্রয়া নিপেতুর্গজভগ্না ইব কর্ণিকারশাখা ॥ ৫১ ॥

এর মধ্যে—নাট্যশাস্ত্রোলিখিত আতোদ্যনামগুলি যথা বীণা, বেণু, পুষ্কর, মৃদঙ্গ, ও ঘন শ্লোকপরাম্পরায় লক্ষ্য হয়। এগুলির মধ্যে **'পুষ্কর' শব্দ "মৃদঙ্গ পণব দুর্দর" আতোদ্যত্রয় অর্থে গৃহীত হয়েছে। যা একমাত্র নাট্যশাস্ত্রেই পাওয়া যায়।**

অতএব, অনুমান হয়, অশ্বঘোষের জীবিত কালে সংগ্রহ-শাস্ত্র কিম্বা নাট্যশাস্ত্রের পান্ডুলিপি ছিল।

'নাট্যশাস্ত্র' নামে মাধ্যমিক সম্পাদনার কালেই পূর্বালোচিত মঙ্গলাচরণ শ্লোক রচিত হয়েছিল সন্দেহ নেই। শাস্ত্র বা গ্রন্থের পুরোভাগে মঙ্গলাচরণ শ্লোক রচনাই ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট এক রীতি। হেতু এই ছিল যে, গ্রন্থের বিশিষ্ট ও মূল প্রস্থান পক্ষে যে বা যে যে ঈশ্বরের অধিকারও অধিষ্ঠান-কর্তৃত্ব, সেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণতিজ্ঞাপন করে সমগ্র গ্রন্থে তাঁদের অধিষ্ঠাতৃত্ব সূচনা করা, এবং সমগ্র রচনা প্রয়াস যাতে বাধিত বা ব্যর্থ না হয় এই উদ্দেশ্যে ঐ ঈশ্বর গণের নিকট কৃপা যাচঞা করা। বর্ণাশ্রমধর্মী শাস্ত্রকারগণ এই নিয়ম স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

এই মঙ্গলাচরণ শ্লোক এবং বৃত্তি-বিকল্প নামে ২২শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে নারায়ণ কর্তৃক মধুকৈটভাসুর সংহারের কাহিনী আলোচনা করলে আনুমানিক সিদ্ধান্ত হয়, মাধ্যমিক সম্পাদনার পরিকল্পিত নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে পরবর্তী কালের কোনও **তৃতীয় বা পরিশেষ সম্পাদকবর্গ** মধুকৈটভ বধাখ্যান প্রক্ষেপ করেছিলেন। এ স্থলে সদোষ প্রক্ষেপই হয়েছে। **প্রক্ষেপের দোষই তৃতীয় সম্পাদনার প্রমাণ**। বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচ্য।

মঙ্গলাচরণ যথা :—

প্রণম্য শিরসা **দেবৌ পিতামহমহেশ্বরৌ**।
নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম ॥

এ স্থলে ব্রহ্মা ও মহেশ্বর, মাত্র দুজন ঈশ্বর-পুরুষের উদ্দেশ্যেই প্রণতি জ্ঞাপিত হয়েছে। কারণ, মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ সমস্ত সংগ্রহশাস্ত্রের মধ্যে মহেশ্বর ও ব্রহ্মা মাত্র এই দুজনেরই অধিষ্ঠাতৃত্ব অনুধাবন করেছিলেন। **মহেশ্বর (অর্থাৎ নটরাজই) হ'লেন প্রয়োগকর্তা; নাট্য ও গান্ধর্ব উভয় পক্ষে; অধিকন্তু, নৃত্ত-নৃত্য পক্ষেও**। গান্ধর্বপক্ষে মহাদেবই ঈশ্বর এই হেতুতে যে—গন্ধর্বাদি দশ দিব্যগণ ও অন্যান্য গণও মহেশ্বর-পার্বতী কেন্দ্রিক পরিকর; কৈলাসাদি রমনীয় সপ্ত-পর্বত (গোত্র) মহেশ্বর-পার্বতী ও দিব্য পরিকরদের গীত-বাদ্য-নৃত্ত-নাট্য করণের আদি লীলাভূমি * ; ব্রহ্মা-ভরত পরিকল্পিত দৈবী পরিকল্পনার রূপে "অমৃতমন্থন" * নামে সমবকার-শ্রেণীর নাট্যপ্রয়োগ দেবাদিদেব মহাদেবের প্রীত্যর্থেই সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হয়েছিল।

অন্য পক্ষে, **ব্রহ্মাই হলেন মাত্র নাট্যবিষয়ে আদি কবি ও উপদেষ্টা। অর্থাৎ**—মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গের দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃষ্টিবলয়ের সর্বোচ্চ স্তরে মহেশ্বর ও ব্রহ্মাই ছিলেন সমগ্র নাট্য সম্প্রদায়ের মূল অধীশ্বর; একজন প্রয়োগ কর্মানুষ্ঠানের সাক্ষ্য, অন্যজন উপদেশ-বাক্য রচনা বিষয়ে সাক্ষ্য। * এঁরাই দুই প্রামাণ্য পুরুষ।

---

* ১৪শ অধ্যায়, ২৬ শ্লোকের শেষচরণ "দিব্যানাংতু নিবোধত॥" পরে, ৩১শ শ্লোক পর্যন্ত অংশে দিব্যগণের "হৈমবৎ" অধিষ্ঠান এবং অন্য দেবতাগণের "দিব্যাবাস" পঠিত হয়েছে।

* ৪র্থ অধ্যায় প্রারম্ভে "অমৃতমন্থন" ও "ত্রিপুরদাহ" নামে নাট্যপ্রয়োগের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য।

* ঈশ্বর-দেব-দেবতাগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান গবেষক যদি মনে করেন, ওসব কথা হ'ল আদিম কল্পনা মাত্র এবং বাস্তব ইতিহাস হ'ল যথা—পিতামহ ব্রহ্মা নামে কোনও ব্যক্তি ছিলেন ভরত নামে ব্যক্তির ঠাকুরদাদা, এবং মহেশ্বর নামে প্রবীণ অপর ব্যক্তি সম্ভবত ভরতের ঠাকুরদাদার বড়ো ভাই; এঁদের উদ্ভবকালের নিশ্চয় ছিল না বলেই এদেরকে আদি ও অনাদি উপাধি দেওয়া হয়েছিল; ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহ'লেও ত' মঙ্গলাচরণ শ্লোকে এঁদের দেব-দ্বয় উল্লেখ করে মর্যাদা প্রদর্শন দোষণীয় নয়

অন্য পক্ষে, ২২শ অধ্যায়ের আরম্ভে, **ভগবান অচ্যুত (কৃষ্ণ, নারায়ণ বা বিষ্ণু)** মধুকৈটভ সংহারের উপক্রম করে যে (বিচিত্রৈরঙ্গহারৈস্তু দেবো লীলাসমুদ্ভবৈঃ। বরঞ্চ যচ্ছিখাপাশং কৈশিকী তত্র নির্মাতা॥" ১৩শ শ্লোক) কৈশিকী বৃত্তির আদর্শ সংস্থাপন করেছিলেন, **সেই আদর্শের সঙ্গে শৃঙ্গার-রস বা আমোদাত্মক রতির** রসভাব-বিভাব-অনুভাব সম্বন্ধ অসম্ভব; কারণ, ব্যাপারটি হ'ল অসুর-নিধন প্রকরণ। এই হ'ল নাট্যশাস্ত্রের রসাধ্যায়গত উপদেশের সঙ্গে সিদ্ধান্ত-বিরোধ।

এখন, নারায়ণও পরতন্ত্রে ঈশ্বর বিশেষ। মাধ্যমিক সম্পাদনার কালে ২২শ অধ্যায়ে যদি মধুকৈটভ-সংহারকাহিনীও শিখাপাশবন্ধনপুরস্কৃত কৈশিকী (কেশবন্ধনসঞ্জাত) বৃত্তির উদ্ভবের কাহিনী থাকত, তাহ'লে, তাঁরা ভগবান নারায়ণেরও নাম উল্লেখ করে মঙ্গলাচরণ রচনা করতেন। কারণ, প্রথমত ব্রহ্মা-মহাদেবের মতো ভগবান নারায়ণও বন্দনীয়। দ্বিতীয়ত, শৃঙ্গার রস-ভাবাদির সঙ্গে কৈশিকীবৃত্তির সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য।

মঙ্গলাচরণ মাধ্যমিক সম্পাদায়বর্গের রচিত। তাঁরা এর মধ্যে নারায়ণ নামের উল্লেখ করেননি। তাঁদের কালের সংগ্রহ-শাস্ত্রে নারায়ণ-মধুকৈটভ আখ্যান ছিলনা। **যেহেতু, নাট্যশাস্ত্রে এই কাহিনী উদাহৃত হয়েছে, অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, এই কাহিনী, এবং সম্ভবত বৃত্তি সংক্রান্ত উপদেশগুলির অধিকাংশই, পরবর্তীকালের কোনও তৃতীয় সম্পাদকবর্গ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত।**

পরতন্ত্র থেকে সংগৃহীত এই বৃত্তি-বিকল্পন রচনা মাধ্যমিক সম্পাদনার মধ্যে প্রক্ষেপ করার সময়ে তৃতীয় সম্পাদকবর্গ নিম্নলিখিত বিষয়ে অনবহিত ছিলেন ঃ—

(১) মঙ্গলাচরণের মধ্যে ভগবান নারায়ণের বন্দনা নেই।

(২) নাট্যশাস্ত্রীয় দৃষ্টি বা উপদেশ অনুগত শৃঙ্গার-রস, রতি নামে আমোদাত্মক স্থায়ি-ভাব, এবং আনুষঙ্গিক বিভাব-অনুভাব ব্যাপারের সঙ্গে কৈশিকীবৃত্তিকে সংপৃক্ত করতে হ'লে নারায়ণ কর্তৃক মধুকৈটভাসুরের বধ-যুদ্ধবৃত্তান্ত আদৌ উপযুক্ত বা সঙ্গত মাধ্যম নয়।

(৩) ৬ষ্ঠাধ্যায়ে ১০ শ্লোকে নাট্যসংগ্রহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্যে "ধর্ম-বৃত্তি-প্রবৃত্তয়ঃ" বাক্যর ক্রম অনুসরণ করে পরে ২৪ শ্লোকে ধর্ম, ২৫শ শ্লোকে বৃত্তি, এবং ২৬ শ্লোকে প্রবৃত্তি বিষয়ে করণের সূচনা আছে। অর্থাৎ—অগ্রে বৃত্তি, পরে প্রবৃত্তির স্থান। ১৪শ অধ্যায়ের প্রবৃত্তির প্রসঙ্গ আছে। সুতরাং, প্রবৃত্তি-প্রসঙ্গের পূর্বেই বৃত্তিঘটিত অধ্যায় প্রক্ষেপ করা উচিত ছিল।

যাই হ'ক, তৃতীয় সম্পাদকবর্গ সম্ভবত মনে করেছিলেন যে নাট্যশাস্ত্রের সংগ্রহপর্যায়ে যখন বৃত্তির উল্লেখ আছে, অথচ, তদানীন্তন (আমাদের দৃষ্টিতে মাধ্যমিক সম্পাদনা) নাট্যশাস্ত্রে বৃত্তিঘটিত অধ্যায় নেই, তখন পরতন্ত্র প্রসঙ্গীভূত বৃত্তিকরণ-প্রকরণ সংগ্রহ করে নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে বৃত্তিবিকল্প অধ্যায় যোগ করলে দোষ হবে না। এক কথায়, কিছু না করার থেকে ভুল করাও ভাল। আমরা এই তৃতীয় সম্পাদকবর্গকে দোষ দিতে পারি না।

অবশ্য, গান্ধর্বাংশ ও পল্লবিত অংশের মধ্যেও তৃতীয় সম্পাদকবর্গের সদোষ হস্তপ্রক্ষেপ আবিষ্কার করা যায়। বাহুল্য ভয়ে, এ স্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম না।

এঁরাই নাট্য-গান্ধারের কর্ণধার ও বাহক ছিলেন। তবে, এই আধুনিক বিচিন্তনও কল্পনান্তর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ছোট গল্প

শিশিরকুমার দাশ

সভ্যতার ইতিহাসে বার্ট্রাণ্ডরাসেলের নাম দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কালের স্রোতে মানুষের বহুকীর্তির ক্ষয়ের মতই তাঁরও আনুষঙ্গিক বহু পরিচয় হারিয়ে যাবে। ইতিহাসে ব্যক্তি মানুষের সমগ্র পরিচয় কোনদিনই থাকেনা। কেউ কবি, কেউ দার্শনিক, কেউ রাষ্ট্রনেতা বলে চিহ্নিত থাকেন। তাঁদের ব্যক্তিত্বের বাকী দিনগুলি রাশি রাশি শুকনো পাতার মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। নির্মম ইতিহাস উদাসীন নৈর্ব্যক্তিকতায় সব বিচার করে। যা কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে সে ফেলে দেয়। যা কিছু খণ্ডকালের তাকে সে উপেক্ষা করে ক্ষণিকের পানপাত্রের মত। তবু মানুষের কাছে মানুষের খণ্ডপরিচয়ের চেয়েও তার সমগ্র পরিচয় সত্য।

এই সমগ্রপরিচয় তার সারা জীবনের নানা ঘটনায়, নানা কাজের মধ্যে। তার কোনটিই ব্যক্তিকে অনুভব করার পক্ষে তুচ্ছ নয়। বার্ট্রাণ্ড রাসেল চিন্তাশীল দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ এ তাঁর প্রধান পরিচয় কিন্তু শেষ পরিচয় নয়। তাঁর মধ্যে যে শিল্পীমন রয়েছে তাও তাঁর একটি অলক্ষিতপূর্ব সত্য পরিচয়। রাসেলের গল্পগুলি পড়লেই এ-কথা মনে হয়।

কটিই বা তাঁর গল্প। মাত্র পাঁচটি। একটি বইতে পাঁচটি গল্প সংকলিত হয়ে বেরিয়েছে। সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে রাসেলও গল্প লেখেন। অবশ্য যাঁরাই তাঁর লেখা মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরাই জানেন যে তিনি ভাষা নিয়ে যত অনুশীলন করেছেন তা সাহিত্যিকের পক্ষেই করা সম্ভব। এই গুণেই তাঁর প্রায় রচনা সুখপাঠ্য। প্রচলিত দার্শনিক গ্রন্থের দুরূহও অমার্জিত ভাষায় কোন স্পষ্ট ও দৃঢ় ধারণা যে আদৌ প্রকাশিত হতে পারে এতেই তাঁর অবিশ্বাস।

কৈশোর থেকেই তিনি সাহিত্যিকের মত নিষ্ঠায় রচনাশিক্ষা করেছেন। অত্যুক্তি কিংবা অব্যাপ্তি দুই ত্রুটির হাত থেকে তিনি মুক্তির সাধনা করেছেন। এবং চিন্তাধারা অবিচ্ছিন্ন ঐক্য বজায় রেখে সৌন্দর্যসৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাঁর রচনার তুলনা বোধহয় শরৎকালের রৌদ্র। একই সঙ্গে দীপ্তি আর শুভ্রতার সমন্বয়। কৌতুক ও চিন্তার সখ্যতা। কোন কোন লেখায়, যেমন তাঁর বিখ্যাত ফ্রিম্যানস ওয়ারশিপ প্রবন্ধে, তাঁর মন আরো নিবিড়ভাবে ধরা পড়েছে। সেখানে মেঘ ও রৌদ্রের মতই হৃদয়ের এক নিভৃতবেদনা ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য এসে মিশেছে। বিশাল বিশ্বের অসহায় শূন্যতা, জীবনের পরিণামহীন ছুটে চলা, পৃথিবীর অপার সৌন্দর্য বেদনার রহস্য সব এসে তাঁর বোধকে আলোড়িত করেছে। ঐ রচনাটি যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের হাত দিয়ে বেরুলে তিনিও বোধকরি গর্বিত হতেন।

তবুও ত ভাবতে অবাক লাগে যে তিনি সত্যিসত্যি গল্পচর্চা করেছেন। রাসেল বলেছেন পাঠকের মত আমারও বিস্ময় লাগে এই ঘটনায়। তবু জানিনা কেন এই গল্পগুলি একদিন লিখতে বসেছিলাম। আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি।

তারপর বিনয়ে বলেছেন আমি এই রাজ্যে অনধিকার চর্চা করছি। জানিনা এই গল্পগুলির কোন মূল্য আছে কিনা। এটুকু জানি যে গল্পগুলি লিখতে আনন্দ পেয়েছিলাম আর সেজন্যই মনে করি যে কোন কোন লোক হয়ত এর থেকে আনন্দ পাবে।

২

রাসেলের বহু চিন্তা, আশা ও বেদনা এই ছোট ছোট পাঁচটি গল্পের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

এ কথা বললে ঠিক হয়না। বলা উচিত এই আশা বেদনাই কাহিনীগুলির মূল রস। তিনি সারাজীবন ধরে মানুষের সমাজসভ্যতা সম্পর্কে যা ভেবেছেন, মানুষের লোভহিংসা শয়তানি যেমন দেখেছেন, মানুষের বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসার জন্য আত্মদান, সত্যের জন্য আহুতি যেমন অনুভব করেছেন তেমনই করে একটি চিত্ররূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

নিজেই বলেদিয়েছেন গল্পগুলি বাস্তববাদী অর্থাৎ রিয়ালিস্টিক নয়। এবং এদের কোন বিশেষ উদ্দেশ্যও নেই। গল্পগুলি যে বাস্তব নয় একথা সত্য। কিন্তু বোঝা যায় যে আধুনিক-কালের বেদনার্ত পৃথিবীই সেই গল্পের পটভূমিকা। তবে কাহিনীগুলোর কোন উদ্দেশ্য নেই—বা তাঁর ভাষা সিরিয়াস্ নয় একথা বলা ঠিক নয়। দুএকটি হালকা মেজাজের কাহিনী আছে ঠিকই। কিন্তু বাকী গল্পগুলির মধ্যে বক্তব্য আছে, উদ্দেশ্য আছে এবং একটি চিন্তার জগৎ আছে।

রাসেলের গল্পের বইটি যে সময় প্রকাশিত হয় প্রায় তার সমকালেই তাঁর New Hopes for the changing world বইটি বেরোয়। বলা যেতে পারে তাঁর একালের চিন্তার দুটি ধারা মাত্র। এই গ্রন্থের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার নানা সমস্যাকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। অনন্ত-কাল ধরে মানুষ ও প্রকৃতির সংগ্রাম চলেছে। দিনে দিনে সেই সংগ্রাম সূক্ষ্ম ও বহুমুখী হয়ে উঠেছে। কিন্তু বর্তমানে তার চেয়েও বড় তার নিজের সমাজ, নিজের বিধিব্যবস্থা, নিজের তৈরী রাষ্ট্র বন্ধনের সঙ্গে সংগ্রাম। উদ্গম হয়ে উঠেছে তার খাদ্যবস্ত্রের সমস্যা। রাজনীতির জটিল আবহাওয়ায় মানুষ পাক খাচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। ধর্মের লড়াই এখনও ফুরোয়নি। এই সঙ্গে তার চরমদ্বন্দ্ব নিজের সঙ্গে। সৃষ্টির কেন্দ্রমূলেই এক গভীর অন্ত-র্দ্বন্দ্ব। মানুষ একই সঙ্গে বহু ইচ্ছা ও বহু বিরোধী ইচ্ছার অধিকারী। গ্রীক ট্রাজিডির নায়িকা অ্যান্টিগোনের মতই ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রবল বিরোধ ঘনিয়ে উঠছে বারবার। মানুষ তার মধ্য থেকে মুক্তি খুঁজছে। সর্ববন্ধন থেকে সে মুক্তি চায়। রাসেল সেই আশা দিয়েছেন।

প্রাকৃতিক সংগ্রাম হয়ত শেষ হবে। হয়ত শেষ হবেনা। কিন্তু এহো বাহ্য। কারণ তাতে মানুষের বহিরঙ্গের ক্ষতি ও ব্যবহারিক জীবনের অসুবিধে হলেও তার মৌলিক ক্ষতি হবে না। কিন্তু মানুষের বাঁচার পথে অন্যান্য বন্ধন আরো বড়। ধর্মভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় সবই সেই বন্ধন। সেই বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি চাই। সে সুস্থ দৃষ্টিতে পৃথিবীকে উপভোগ করবে। তার সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেবে। তার ভয় থাকবে না। যথার্থ স্বাধীনতার আস্বাদ পাবে। এই স্বপ্নের জগতের জন্য রাসেল ভেবেছেন। কাজও করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর রাসেল যুদ্ধবিরোধী দলের প্রধান নেতা হয়ে উঠেছিলেন। একটি প্রবন্ধ লেখার জন্য তাঁকে দণ্ড দিতে হয়েছিল। কারাবাসও করতে হয়েছিল কিছুদিন। এছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে রাষ্ট্রের বন্ধনের জ্বালা নানাভাবেই তিনি অনুভব করেছিলেন।

এই গল্প গ্রন্থে (Satan in the suburbs) সেই বন্দী মানুষের ছবি আছে। মানুষ নানাভাবে বন্দী। তাঁর একটি গল্প আলোচনা করা যাক। Brave New Worldএ আমরা যান্ত্রি-কতার ও বৈজ্ঞানিকতার চরম জীবন লক্ষ্য করেছি। রাসেলের The Infra-Rediscope বা 'লালউজানীবীক্ষন যন্ত্র' গল্পটিতে বিজ্ঞাপনের চরম অবস্থা লক্ষ্য করার মত।

লেডি মিলিসেন্ট ছবি আঁকেন। তাঁর স্বামী স্যার পার্বীয়াস। পয়সার জোরে তিনি বিজ্ঞাপনের জগৎ চালান। ডেলি লাইটনিং এর সম্পাদক স্যার বুলবাস তাঁর বন্ধু। বিজ্ঞাপনের জোরে এঁরা পারেন না এমন কিছু নেই। জঘন্য পচা মদ বিজ্ঞাপনের জোরে চমৎকার জিনিস বলে চালাচ্ছেন। নোংরা, ধোঁয়াটে, কাদাভরা সমুদ্রের তীরকে অপূর্ব মনোরম তরঙ্গমুখর সমুদ্র-

তীর বিজ্ঞাপন দিয়ে যাত্রী আমদানী করছেন। এঁদের সিণ্ডিকেটে পেপ্ড্যাক মার্কল নামে এক লোক ছিলেন। তিনি চরম সিনিক। মানুষের সভ্যতা ও সমাজের তিনি বিরোধী। তাঁর সমস্ত বাল্য কৈশোর ও যৌবনের নানা ব্যর্থতাই তার কারণ।

তিনি একজন বৈজ্ঞানিক। নানাভাবে তিনি পয়সা জমিয়ে একটি বিজ্ঞানাগার করলেন। সকলের অবজ্ঞা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সবাই স্বীকার করল। অবশ্যই ভালো মনে হয়। সেই ভদ্রলোক এই সিণ্ডিকেটের মিটিং-এ বললেন যে এখন সবাই নিউক্লিয়ার এনার্জি ইত্যাদি নিয়ে মাতামাতি করছে। এ ব্যাপারটা পুরনো হয়ে গেছে। আমরা একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছি তার নাম লালউজানীবীক্ষন যন্ত্র। আমরা লোককে বিশ্বাস করাবো যে এই যন্ত্রে অদৃশ্য অদৃশ্য জিনিস দেখা যায়। এখন আমি এই যন্ত্র দিলাম। কিন্তু কিভাবে তা ব্যবহার হবে তা বলতে পারেন স্যার বুলনাস ও স্যার পাবলিয়াস।

তাঁরা ঠিক করলেন যে মঙ্গলগ্রহ থেকে আক্রমণ হবে পৃথিবীতে এইরকম একটা কিছু রটাতে হবে। কিন্তু এই যন্ত্র কিনলে কোন ভয় নেই। কাগজে বিজ্ঞাপন আরম্ভ হয়ে গেল। আর স্যার প্যাবলিয়াস তাঁর স্ত্রী মিলিসেণ্টকে দিয়ে একটি মঙ্গলগ্রহবাসীর ছবি (অবশ্যই কাল্পনিক) আঁকালেন। লোকের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ল। মঙ্গলগ্রহবাসীর একটি ছবি ছাপানো হল চারদিকে। পৃথিবীতে হৈ চৈ পড়ে গেল।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন আরম্ভ হল। অজস্র বাঁক্ষণযন্ত্র বিক্রি হতে লাগল। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা ক্ষেপে গেল। প্রথম প্রথম লোকে জানাতে লাগল যে যন্ত্র দিয়ে কিছুই দেখা যায় না। তাদের চিঠি কাগজে ছাপা হল না। তারপর বিজ্ঞাপন বেরুল যে যারা এই যন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা বিশ্বাসঘাতক। পৃথিবীদ্রোহী। লোকে ভয়ে চুপ করল। যারা বলল মঙ্গলগ্রহে লোক নেই তাদের জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। সোভিয়েট রুক ও আমেরিকা ও ইউরোপ এক হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। সারা জগতে সবাই যখন বিশ্বাস করছে যে মঙ্গলগ্রহবাসীরা আসছে তখনও পৃথিবীতে কিছু মানুষ ছিল যারা এই সব কথা বিশ্বাস করেনি। বৈজ্ঞানিকদের টাকা দিয়ে কিনে রাখা হয়েছিল কাজেই তারা সত্য কথা বলতে পারছে না।

অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল কিন্তু সাহস ছিলনা। এমন সময় শোভেলপেনি নামে এক তরুণ এই মিথ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে স্থির করল। এক কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে তার দিন কাটতে লাগল। তাকে সবাই সাবধান করল। কারণ তাহলে তাকে দিন কাটাতে হবে কারাগারের অন্ধ-কারে। তবুও শোভেলপেনি লেডি মিলিসেণ্টের সঙ্গে দেখা করল। এবং শেষ পর্যন্ত সত্য জানল মানুষ। তার ফলে একটা প্রবল যুদ্ধ বাধল পৃথিবীতে নিজেদের মধ্যেই। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধের মধ্যে দেখা গেল যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মারা যাচ্ছে। তাদের গায়ে অস্ত্রের দাগ নেই। এইবার সত্যিসত্যি মঙ্গলগ্রহবাসীরা এল।

গল্পটি শেষ করা হয়েছে এইভাবে যে মঙ্গলগ্রহবাসীরা এই কাহিনীটা লিখছে। তারা আবার শুক্রগ্রহ অভিযান করবে।

গল্পটির স্বাভাবিক গঠনকৌশল ও বর্ণনাভঙ্গী এইচ, জি, ওয়েলসের বিখ্যাত স্টার গল্পটি স্মরণ করায়। যদিও সে গল্প অনেক উন্নত। কিন্তু রাসেলের গল্পের বক্তব্য অন্য। মানুষের ভয় বা অন্যগ্রহের মানুষের আগমনের রহস্য ও বিস্ময় তার মূল উপাদান নয়। মানব সভ্যতার এক চরম সঙ্কটের ছবি ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। যখন তার ইচ্ছা, তার বিজ্ঞানবুদ্ধি তার চিন্তা সমস্তই এক ভয়াবহ ডিক্টেটারের হাতে যায় তখন সে অসহায় রূপ হয় তার চেয়ে মৃত্যু অনেক কাম্য।

লেডি মিলিসেণ্ট শেষ মুহূর্তে সব রহস্য ফাঁস করলেন। তাঁর জীবনে নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলে গেল হঠাৎ। মনে হল এক বন্ধ, কৃত্রিম জগতে তাঁর এতগুলো দিন কেটেছে। আর সেই তরুণ যুবকের মনে হল এই ধ্বংসের মধ্যে একজন আত্মার সঙ্গী বেঁচে আছে। এখনও সত্যের শিখা অম্লান এবং স্তিমিত।

'নিউ হোপস'-এর মধ্যে রাসেল বলেছেন : One of the effects of fear is submission to leaders. Any social group which is feeling acute fear looks instinctively for a leader whom it believes that it can trust. Sometimes the leader is good, some he is bad, but the instinctive mechanism is the same in is their case... submission to leaders takes it away the sense of individual responsibility and the habit of individual thought.

এই গল্পের মধ্যেও তারই রূপ। ভয়ে সমস্ত মানুষের কণ্ঠরুদ্ধ। শুধু একটা বাইরের শক্তির ভয়ে নয়, সামাজিক ডিকটেটারদের ভয়ে। তারই মধ্য থেকে ব্যক্তিকণ্ঠ উদ্গত হয়েছে। ব্যক্তি বসে বসে ভাবছে কী আশ্চর্য আজ একটা মিথ্যে বিপদের আশঙ্কা করে পৃথিবী এক হয়েছে। ক্রেমলিন আর হোয়াইট হাউস এক অনুপস্থিত শত্রুর বিরুদ্ধে এক হয়েছে। বোধ হয় মিথ্যের মধ্য দিয়েই মানুষ সুস্থ হয়ে বাঁচবে। বোধ হয় মানুষের মন এমন যে সত্যই তার কাছে বিপজ্জনক (Perhaps it is only though lies that men can be induced to live sensibly. Perhaps human passions are such that to the end of time truth will be dangerous.)

শেষ পর্যন্ত কাহিনীর এই নির্ভীক তরুণ আত্মহত্যা করলেন নিদারুণ অন্তর দোলায়। রেখে গেলেন ভবিষ্যতের জন্য সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব; সত্য আর জীবনের বাঁচবার প্রেরণা। এই ব্যক্তিজীবনের যে আত্মদান একথা রাসেল তাঁর নিউ হোপস গ্রন্থেও স্মরণ করেছেন : I find many men now a days oppressed with a sense of importence, with the feeling it at in the vastness of modern societees there is nothing of importance that the individual can do. This is a mistake. The individual, if he is filled with love of mankind, with breadth of vision, with courage and with endurance, can do a greatded. এই কাহিনীর নায়ক আর্তনাদ করেই মরেছে—'When I was a younger man I had hopes, high hopes.'

এ যুগের মানুষের এই অসহায় জীবন জিজ্ঞাসা এবং হতাশ্বাস এই কাহিনীর প্রাণ।

৩

পৃথিবীর ভয়াবহ রূপ, তার আত্মার হাহাকার Satan in the Suburbs গল্পটিতে নিষ্ঠুরভাবে স্পষ্ট। লেখক ডাঃ মুরডক ম্যালাকো নামে এক ভদ্রলোককে জানতেন। তাঁর বাড়ির সামনে লেখা ছিল Horrors Manufactured Here, লেখকের পরিচিত চারজন ব্যক্তির মনের মধ্যে নানা অশুভ চিন্তা জাগিয়ে ম্যালাকো তাদের সকলকেই পৃথিবীর জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন।

ম্যালাকোর কৌশল ছিল অদ্ভুত। যেমন লেখকের এক বন্ধু অ্যাবারক্রজি। অত্যন্ত ভালো লোক। সামনের বার বার্থডে অনার্স লিস্টে তার নাম উঠবে। শোনা গেল ব্যাঙ্কের টাকা তছরূপের অভিযোগে পুলিশ তাকে ধরেছে। লেখক অনেক কষ্টে তার কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা জানলেন। অ্যাবারক্রজি প্রায়ই ম্যালাকোর বাড়ি যেতেন। তার টাকা দরকার। তার অর্থাভাবের কথাও হয়ত বলেছেন। ম্যালাকো উদাসীনভাবে এসব কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলেছে গল্প শোন।

এই বলে সে গল্প শুরু করেছে। এক ভদ্রলোক ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। তাঁর টাকার বড় দরকার ছিল। কি করেন। তিনি প্রচুর টাকা চুরি করলেন। চুরি করে টাকাগুলো তাঁরই এক অধস্তন কর্মচারীর বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিলেন তার অজান্তে। তাকে না জানিয়ে তার নামে ঘোড়ার টিকিট কাটলেন। ঘোড়া হারল। ওখান থেকে চিঠি দিল তুমি বাজী হারার টাকা দিচ্ছনা। এমন সময় দেখা গেল ব্যাঙ্কের টাকা চুরি হয়েছে। পুলিশ তাকে ধরল। আর ভদ্রলোকের সম্মান বাড়ল। তিনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হলেন। তারপরও তিনি—এইটুকু বলে ম্যালাকো থামলেন। অ্যাবার ক্রজির মনে জাগিয়ে দিলেন অশুভ চেতনা। কিন্তু অ্যাবারক্রজি এই ভাবে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ল।

এইভাবে সে আরো তিনজনের সর্বনাশ করল উপদেশ দিয়ে। একজনকে অশ্লীল বই লেখার পরামর্শ দিল। মিঃ কার্ট বাইটকে বলল ব্লাকমেল কর। আর মিসেস এলার কারকে দিল স্বামী-হত্যার পরামর্শ। অথচ সে স্পষ্ট ভাষায় কোনদিন কিছু বলেনি। সবই গল্প করে বলেছে।

এদিকে মিসেস এলারকার স্বামী হত্যা করলেন। কিন্তু তার পরই তাঁর মনে শুভ চেতনা জেগে উঠল। তিনি সত্যকথা বলতে চাইলেন। কেউ শুনলনা। তাকে পাগলা গারদে রেখে দেওয়া হল। লেখক শেষ পর্যন্ত ম্যালাকোর কাছে গিয়ে উত্তেজিত অবস্থায় তাকে গুলি করে মারলেন।

ম্যালাকো হত্যার পর লেখকের জীবনে বেশ শান্তি এল। জীবনের উপর বিশ্বাস এল। তিনি প্রায়ই মিসেস এলারকারের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন পাগলা গারদে। লেখক ইতিমধ্যে ভালোবাসলেন এবং বিয়ে করলেন। এখন তিনি পরিপূর্ণ সুখী।

কিন্তু লেখক প্রায়ই ম্যালাকোকে স্বপ্ন দেখেন। সে চিৎকার করে বলে ভেবেছ, আমি পরাজিত হয়েছি, তাই না!

লেখক চিৎকার করে ওঠেন। স্ত্রী ঘরে ঢোকেন। অবাক হয়ে যান স্বামীর আচরণে। সে যেন ইদানীং রোজ স্বপ্নের মধ্যে নির্জন চিন্তার মধ্যে আসতে লাগল : তুমি মনে করছ যে মানসিক সুস্থতা ফিরে পেয়েছ। তুমি কি মনে কর একটা রিভলবার দিয়ে তুমি আমার শক্তি অস্বীকার করতে পারবে।

রোজই এক স্বপ্ন। তিনি শয়তানকে মেরে ফেলছেন। আর শয়তান তাঁর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। স্ত্রী ভাবলেন তিনি পাগল হয়ে গেছেন। তাঁর স্থান হল পাগলাগারদে। এখন শুধু তাঁর একটি সান্ত্বনা : Once a year, the better behaved among male and female lunatics are allowed to meet at a well patorlled dance. Once a year I shall meet my dear Mrs. Ellerker whome I ought never to have tried to forget, and when we meet, we will wonder whether there will ever be in the world more than two same people.

মানুষের মনের ভেতর যে শয়তান রয়েছে সেই শয়তানই ডঃ ম্যালাকো। সে সম্পদ চায়না। খ্যাতি চায়না। চায় শুধু মনুষ্যত্বের প্রতিমুহূর্তের অপমান। যে কেউ চুরি করেছে অসৎ পথ নিয়েছে তারাই বিরাট হয়েছে। সম্মান পেয়েছে। পাচ্ছে। যারা ভদ্র, যারা সাধু তারা দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটায়। এই নগ্ন সত্য রয়েছে মানুষের সামনে। এরই মধ্যে দিয়ে শয়তান আসে। সে প্রলোভনের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যদিনা তার আত্মার জয় ঘোষণা করতে পারে তবে তার সভ্যতা বৃথা। রাসেল তাঁর জ্ঞানে বুদ্ধিতে অনুভূতিতে মনুষ্যত্বের যে রূপ উপলব্ধি করেছেন তারই হাহাকার ও মহিমা প্রতিষ্ঠা করেছেন এই কাহিনীগুলির মধ্যে।

৩

এমিলি জোলা ও সাহিত্যে বাস্তববাদ

মনোজ রায়

প্যারীর বিখ্যাত গ্রন্থাগার, 'বিবলিও থেক্ ইম্‌পেরিয়েল'—তার প্রকাণ্ড রিডিং হল—হাজার হাজার লোক সেখানে পড়ছেন। বিকেলের ঘন্টা পড়লো—রিডিং হল বন্ধ হওয়ার সময় হয়েছে। প্রায় সকলে একসঙ্গে উঠে পড়লেন। চোখে চশমা প্রায় উনত্রিশ বছরের একজন যুবকও সকলের সঙ্গে উঠে পড়লেন। দিস্তে দিস্তে কাগজে যুবকটি সারাদিন ধরে লিখছিলেন—নানা লেখা হতে উদ্ধৃতি—নানা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বহু বংশানুক্রমিক ইতিহাস; মোটা মোটা ভারী ভারী বইগুলো তিনি এবার বন্ধ করলেন। পাশে একজন কবি বইগুলোর শিরোনামা দেখে কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেন—

আপনি কি বৈজ্ঞানিক?

হ্যাঁ —

উনত্রিশ বছর বয়স্ক এমিল এডোয়ার্ড চার্লস এন্‌তোইনে জোলা উত্তর দেন। বিরাট জনস্রোতের সঙ্গে ক্লান্ত শ্রমিকের মত তিনি তখন ফিরে চলেছেন, চিন্তা করতে করতে চলেছেন কোন উপন্যাসের কাঠামো। শক্তিশালী চেহারা লম্বাটে গোল মাথা বালজাকের মত নাকের ডগাটা বিভক্ত। এক হাতে কেরানীদের ডেস্‌প্যাচ্ অন্য হাতে ছাতা নিয়ে তিনি প্যারী মহানগরীর ভীড়ের সঙ্গে মিশে চলছেন —

কি বিশাল ভীড় প্যারী নগরীতে! রু মত মারতের আর বুলেভার্ডের কোনায় এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা। রাস্তার দুধারে সারবন্দী লোহার চেয়ার—লোকে ঠাসা; আরো হাজার হাজার নরনারী জলস্রোতের মত চলেছে। জোলা এই ভীড়ের মধ্যে কষ্টে সৃষ্টে পথ করে চলেছেন। আজ আর তাঁর তাড়া নেই। 'লা ট্রিবিউন' পত্রিকার জন্য লেখাটা সকালে দিয়ে এসেছেন —এবার 'লা সিক্‌লে' পত্রিকায়—তারপর বাড়ী।

ভীড়ের মধ্যে ধাক্কা লাগে একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে —

ক্ষমা— মেয়েটি একটু ম্লান ভাবে তাঁর দিকে চায়।

খুব সুন্দর মেয়েটি। মাথায় এক রাশ ঢেউ খেলানো চুলের ওপর সুন্দর করে একটা টুপী বসানো; গায়ে একটা সবুজ সিল্‌কের কোট—ধারগুলো তার কাজ করা—বাদামী রংএর একটা স্কার্ট; ভারী স্কার্ট খানা মেয়েটি খানিকটা তুলে ধরেছে—নীচের স্কার্টের কাজটা চোখে পড়ে—আর তার নীচে সুগঠিত উরু দুটো—

জোলার সময় নেই—এসব সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে থাকতে তাঁর সময় নেই। তিনি বোধ হয় স্বপ্নে ছাড়া কখনো কাউকে ভাল বাসেন নি— আর বিরাট সুন্দরী প্যারী নগরীও তাঁকে কখনো ভালবাসেনি— কোন সুন্দরী কখনো তাঁর জন্য ভাবাবেগে আকুল হয়ে ওঠে নি। প্যারী নগরী বার বার তাঁকে শুধু দুর্বিসহ জীবন যাত্রায় ঠেলে দিয়েছে।

চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তাঁকে এগোতে হয়েছে—নিষ্করুণ আবহাওয়ার মধ্যে। ১৮৪০-এর ২রা এপ্রিলে প্যারী নগরীর উপকণ্ঠে একদিন তাঁর জীবনযাত্রা সুরু হয়। বাল্যকালে তিনি ছাত্র হিসাবে মোটেই ভাল ছিলেন না। এইক্স-এর একটি কলেজে পাঠ সমাপ্ত করে ১৮৫৮ সনে তিনি প্যারীর সেণ্ট লুই কলেজে ভর্তি হন। দুই বছরের পর ১৮৬০ অব্দে

তিনি ডিগ্রী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন—সাহিত্য বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়াতে, তাঁর ভাগ্যে ডিগ্রী পাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

মাইন নদীর বিরাট ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে সেদিন তিনি নিজের চরম দুর্দশা আর গ্লানির কথা ভাবছিলেন। পরে নাকি শোনা গিয়েছিল আত্মহত্যা করে তিনি জীবনের গ্লানি দূর করতেই ব্রীজের উপরে দাঁড়িয়েছিলেন। নদীর দুই কূল ধরে প্যারীর সুসজ্জিত রূপ-রূপসী নগরী—যার সজ্জিত মুখোস তিনি পরে খুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন—সেই প্যারীর রূপ—সাজানো ঐশ্বর্য হতাশায় পরিপূর্ণ তাঁদের মত জনতাকে কি ভাবে আড়ালে ঢেকে রেখেছে তিনি যেন সুষ্ঠ দেখতে পেলেন। আত্মহত্যা করা তাঁর আর হয়ে উঠলো না—দীর্ঘতর হতাশার মধ্যে জীবন যাত্রা সুরু করার জন্য তিনি যেন আবার ফিরে এলেন।

এইবার আরম্ভ হোল তাঁর কঠোর জীবন যাত্রার সংগ্রাম; সহায়হীন, আশ্রয়হীন ভাবে বিশাল নগরীতে তিনি কর্মহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়ান। সহরের নিকৃষ্টতম অংশে তাঁকে থাকতে হয়—যেখানে দরিদ্রতম লোকেরা দিনের পর দিন পশুর মত জীবন যাপন করছে।

চারিদিকে নোংরা আবর্জনা—অভাব, অনটন, শঠতা আর লজ্জাস্কর ব্যভিচার স্ত্রী পুরুষ নির্বিচারে পশুর মত গাদাগাদি হয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করছে; সকলের মধ্যে নিদারুণ হতাশা—মানুষ পশুর স্তরে নেমে গিয়েছে—তাদের চোখে ক্ষুধা আর লোভ ছাড়া অন্য কোন জগৎ নেই—নৈতিক মানদণ্ডের নিম্নস্তরে নেমে গিয়ে মানুষ পশু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই চরম দারিদ্র—হতাশার অন্তিম অধোগতি দেখতে দেখতে জোলার, অন্তরাত্মা বিষিয়ে উঠেছে; এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ—আবর্জনা—নোংরা আবহাওয়া—জোলার মন বিদ্বেষে ভরিয়ে দিয়েছে। সিঁড়ীগুলো তৈলাক্ত—জায়গায় জায়গায় ইঁটের পাঁজর বেড়িয়ে পড়েছে—এখানে ওখানে ছাতা পড়ে রয়েছে; দেওয়ালগুলো স্যাঁতস্যেতে—ঘরের মধ্যে একটা বোঁটকা গন্ধ যেন অনেকগুলো পশু গাদাগাদি হয়ে বন্ধ হয়ে রয়েছে; দুপুরেও আলো না জ্বাললে ভেতরে ঢোকা যায় না; রুগ্ন আর মুমূর্ষু শিশুদের আর্তনাদ আর কাৎরাণি—আর পশুদের মত প্রহার—বেশ্যাকে ঠকিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার চিৎকার আর অশ্রাব্য গালাগালি—মাতালের মাতলামি আর নোংরামি—এই ছিল তাঁর পরিবেশ। কিছুক্ষণের জন্যও যে এখানে থেকেছে তার মধ্যে চিরকালের জন্য একটা বিভীষিকা আঁকা হয়ে গিয়েছে।

দুই বছর জোলাকে এই ক্লেদাক্ত শারীরিক আর নৈতিক অধোগতির মধ্যে থাকতে হয়েছিল। তিনি এসেছিলেন মিষ্টি রোদ্দুর ভরা মাঠ হতে। কিন্তু এই আবর্জনাময় পরিবেশে থেকেও তাঁর সৃজনীশক্তি নষ্ট হয়নি। সারাদিনের পরিশ্রমের পর তিনি নিজের কুঠুরিতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতেন। ঠাণ্ডা ঘর—শরীর আড়ষ্ট হয়ে আস্‌তো। চিন্তার রাজ্য তবু সারাদিনের অভিজ্ঞতার পথে ছুটে চলতো। কোনদিন যদি সৌভাগ্যক্রমে বাতি কেনার জন্য পয়সা জুটতো তবে সেটা জ্বালিয়ে লিখতে বসতেন। ঠাণ্ডায় হাতের আঙ্গুলগুলো জমে আসতো—সামান্য মোমবাতির উত্তাপে হাত গরম হয়ে উঠতে পারতো না। তারপর অনাহার। কোনও দিন হয়তো জুটতো 'অলিভ অয়েল'—কিংবা এক টুকরো শুকনো রুটি—আবার বহুদিন কাটতো অনাহারে, অভুক্ত অবস্থায় বিছানায় ছটফট করে। কোন কোন দিন আর সহ্য করতে না পেরে দরজা জানালা বন্ধ করে তিনি চড়াই পাখি ধরতেন—তারপর কোন আগুনে আধা ঝলসে সেটা গো-গ্রাসে গিলতেন।

জামা, কাপড় একে একে বন্ধক পড়েছে—নয়তো বিক্রী করতে হয়েছে। আলোকজ্জ্বল সুবর্ণবতী প্যারী নগরীতে এই তরুণ সামান্য মাত্র আভরণে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ঘরে বসতে

পারেন না—আগুন নেই; এক পয়সা দামের বাতিটা আড়ষ্ট হাতে কোন রকমে ধরে টিম টিমে আলোতে কয়েক লাইন লিখতে পারেন।

তবু আবার এই ঘর হতে বিতাড়িত হয়েছেন রাস্তায়—বাড়ীওয়ালা ভাড়া না পেয়ে রাস্তায় দূর করে দিয়েছে। আবার আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে আরো নিকৃষ্টতম স্থানে—এক খোঁয়াড় থেকে অন্য খোঁয়াড়ে—এক এ'দো ঘর থেকে আর এক এ'দো ঘরে।

"আমি এই ভাবেই প্যারীকে দেখেছি—সমস্ত দিক থেকে—নিষ্করুণ ভাবলেশহীন ভাবে—"

অনাহারের দিনগুলি এক সময় তাঁর শেষ হয়। একটা ছোট ফার্মে বছর খানেক কেরাণী-গিরি করার পর তিনি কর্মচ্যুত হন।

এরপর ১৮৬১ সনে হ্যাচেটের বইয়ের দোকানে বই বাঁধানোর সামান্য একটা চাকুরী পান। বই বাঁধাইএর কাজ। কিন্তু এক রকম বলতে গেলে সাহিত্য চর্চার এই সময় হতেই তিনি সুযোগ পান। সারাদিনের খাটুনির পর অবসর সময়ে তিনি লিখতে থাকেন। 'পেতিত্ জার্নাল' আর "ল ভিয়েপ্যারিসিয়েঁ" নামে দুইটি পত্রিকায় তিনি ছোট গল্প আর "ল এভারসন্ত" এবং "ফিগারো"তে তিনি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৪ সনে তিনি 'ক'তে এ নি'ও' এবং ১৮৭৪ সনে তিনি 'নৌভেরক্স' নামক দুইটি গল্পের বই প্রকাশ করেন। এরপর "লা কম্ফোঁসিও দ্য ক্লদে" নামে একটি উপন্যাস প্রকাশ করেন। উপন্যাসটি সেনসার বোর্ড আটকে রাখে। বহুদিন পরে সেনসারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পর বাইরে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু, বান্ধব, পাঠকগোষ্ঠি তাঁর উপর ঝিপ্ত হয়ে ওঠেন। হ্যাচেট সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সংস্রব ত্যাগ করেন।

বইগুলো প্রকাশে তাঁর তেমন অর্থের সমাগম হয় না। কিন্তু এতে বিশিষ্ট কিছু লোক তাঁর বন্ধু হয়ে ওঠে। রুমে এই বন্ধুরা একটা স্থায়ী আড্ডা গড়ে তোলেন। আড্ডার মধ্যে ধীরে ধীরে বহু বিখ্যাত লেখক ও শিল্পী এসে জমায়েৎ হন। তাঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান ছিলেন, ফ্লবেয়ার, মোঁপাসা, ডানকোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়, হ্যাসিম্যান, শিল্পী সিজানে প্রভৃতি।

এই দল বা গোষ্ঠী সাহিত্য জগতে সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গী নিয়ে অবতীর্ণ হন। সে ভঙ্গীটা হচ্ছে পুরোপুরি বাস্তববাদ। তাঁদের বাস্তববাদের ভঙ্গীটা ডানকোর্ট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের উপন্যাস—'জারমিনি লাসেরতোর' (১৮৬৫) ভূমিকাতেই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাঁদের মতে, ঔপন্যাসিকের কর্তব্য হচ্ছে বাস্তব ঘটনার লিপি করা— "A novelist is to adopt the serious, passionate, alive form or literary study and of a sociological inquiry to become the moral historian of his time by analysis and exact psychological investigation and to assume the duties and methods of scientific workmanship".

তাঁদের মতে ঔপন্যাসিকের শুধু কাল্পনিক ভিত্তির উপর উপাদেয় রচনা সৃষ্টি করা অর্থে, জগতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। ঔপন্যাসিকের কাজ হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত—অনুসন্ধান আর বিশ্লেষণের দ্বারা অন্তর্নিহিত মানুষকে উদ্ঘাটিত করা; সমাজ ব্যবস্থাকে তিল তিল করে বিশ্লেষণ করে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এখানে মানুষ, মানুষই—তার পারিপার্শ্বিক সমাজ ব্যবস্থা আর তার বংশধারা তাকে যেমন তৈরী করেছে; এখানে দৈব নাই—অবাস্তব কোন ব্যাপার এর মধ্যে আসতে পারে না—কিংবা বাস্তব ব্যাপারকে সৌন্দর্যের দ্বারা উদ্ভাসিত করে তার পচনটাকে আড়াল করিয়ে দেওয়া এখানে চলে না।

ডানকোর্ট ভ্রাতৃদ্বয় এই বাস্তবভঙ্গী নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য জগতে আবির্ভাব হলেও জোলাই এই ভঙ্গীটাকে চরম ভাবে টেনে নিয়ে চলেন। তাঁর লেখায় প্রথম হতেই তাই বাদ পড়ে আধিভৌতিক, বুদ্ধির অগম্য প্রভৃতি বিষয়। মানুষ তার বাইরের সবটা নিয়েই মানুষ—তার প্রতিটি ইন্দ্রিয় প্রতিটি রিপু ঠিক কারণে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে ঘাত প্রতিঘাত করবে—দৈব বা দৈবাৎ বলে কোন কিছুই থাকবে না—বা ঘটনা বলেও কিছু থাকবে না। যা পরিণতি—তা হচ্ছে সমগ্র মানবের শারিরীক, মানসিক আর পারিপার্শ্বিকের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলস্বরূপ। জোলা প্রথমেই তাই তাঁর নীতি বলেছেন—"আর্টকে ভাবালুতা, কল্পনা আর অনিশ্চিত ম্যাজিক হতে একেবারে নির্মুক্ত বাস্তব বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করা"।

থেরেসে রাকুইন উপন্যাসের (১৮৬৮) দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর এই বাস্তব ভঙ্গীটা ব্যাখ্যা করে ঔপন্যাসিকের কর্তব্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন সাহিত্যের কাজ হচ্ছে "সারজিক্যাল অটোপসি"—খন্ড খন্ড করে বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয় করা। ঔপন্যাসিকের কর্তব্যও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। "ঔপন্যাসিক হচ্ছেন একজন ডিমন্স্ট্রেটার; তাঁর পড়ার ঘর হচ্ছে তাঁর ল্যাবরেটরী। তিনি কল্পনার আলোকে পর্যবেক্ষণ আর অনুসন্ধান করে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন—যার মূল্য অভাবনীয়।"

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য—সমাজের ক্লেদ দূর করার জন্য বাস্তববাদের নোতুন ভঙ্গী নিয়ে তাঁরা অবতীর্ণ হন, যাকে ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে বলতে হয়—শুধু লেখার জন্য লেখা নয়; লেখা হচ্ছে মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে রোগের বিশ্লেষণ করে একেবারে নিষ্ঠুর সত্যে উপনীত হওয়া। তাঁদের মতে, এই মহৎ প্রেরণা আসে অন্তরের প্রচণ্ড বিক্ষোভ থেকে—রোগ দূরীকরণের আকাঙ্খা থেকে। সেজন্য তিনি বলেন—'সাহিত্যিকের প্রথম কাজ হচ্ছে বিমুগ্ধ হওয়া; কোন কিছুতে বিমুগ্ধ না হলে—কোন মহৎ প্রেরণায় উদ্গীত না হয়ে লিখতে যাওয়ার অর্থ গণিকাবৃত্তি করা—বৃত্তির জন্য নিজেকে বিকৃী করে ফেলা। যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে বিক্ষোভ ফেটে পড়তে থাকবে ততক্ষণ লেখা আপনা আপনি সৃষ্টি হয়ে আসতে থাকবে—বিশ্লেষণ আপনি সহজ হয়ে আসবে, তার মধ্যে বিচার থাকবে না—মতামত থাকবে না—'

সমাজ এবং তার প্রতিটি স্তরের লোকদের টেনে এনে তিনি তাঁর ল্যাবরেটরীতে বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করেন। নিজেকে তিনি কখনো ভাবালু সাহিত্যিক বলেন নি। তিনি বলেছেন, 'কোন একটা গল্পের প্লট তাঁর মাথায় কিল বিল করে ওঠে না—আবেগে তাঁকে ঠেলতে থাকে না।' "দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি স্তূপাকার ভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন। সমস্ত মাল-মশলা সংগৃহীত হলে তিনি তাঁর ল্যাবরেটরীতে বসে সেই স্তূপাকার তথ্যগুলি পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করেন—আর তার ফল হিসাবে অদ্ভুত ভাবে এই অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ ভাবে জেগে ওঠে। তিনি তখন প্রতীক হিসাবে পটভূমি স্থির করে দিনের পর দিন সেই পটভূমিতে গিয়ে সেই পরিবেশের আচরণ, কথা বার্তা, ব্যবহার, হালচাল নিখুঁত ভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে সমাজের সেই স্তরের ব্যাখ্যা করতে সুরু করেন—ভাবলেশহীন ভাবে।" দিনে মাপা ছাপানো চার পৃষ্ঠা—সমস্ত লেখা শব্দ, বিন্যাস, বর্ণনা এমনভাবে সুপরিকল্পিত যে জোলা দ্বিতীয়বার তা কাটাকুটি করেন না—এমন কি প্রুফ পর্যন্ত দেখেন না।

ভঙ্গীটা প্রকাশের জন্য নিজের রীতির কথা তিনি নিজেই বলেছেন—"আরো—আরো ব্যাখ্যা বিশদভাবে ব্যাখ্যা; বিশেষণ, আরো বিশেষণ প্রয়োগ—যেন সমস্তগুলো প্রাণময় গতিযুক্ত হয়ে একটা বিরাট আবর্তের মত গিয়ে প্রতিটি প্রাণকে উদ্বেলিত করে তোলে।"

তাঁর বাস্তবভঙ্গী নিয়ে লেখা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে "রুগো মোকাঁট" সিরিজের

কুড়িখানি উপন্যাসে। এই ধরনের লেখার প্রথম প্রেরণা তিনি পান বালজাকের 'কমিডিয়া হিউমেন' সিরিজের বইগুলো হাতে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এই কুড়িখানা উপন্যাস সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের নিখুঁত ভাবে চিত্রণ করে—রাজা, মন্ত্রী—রাজসভার চক্রান্ত হতে আরম্ভ করে মধ্যবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের—রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার, শিল্পী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, কৃষক, খনির মজুর, বিপ্লবী, তরুণ, বিপ্লবের পদধ্বনি, সৈন্যবিভাগ বারবণিতা—আধুনিক জগতের কোন শ্রেণী তাঁর লেখনী হতে বাদ পড়ে নি। প্রত্যেকটি চরিত্র তার পারিপার্শ্বিক আর ঐতিহ্য নিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ তাদের অভিব্যক্তি, তাদের এই ভাবে পরিণতি আর বাস্তব জগতের সমাজ তার জন্য কি ভাবে দায়ী তা মনকে আঘাত করে শিহরিত করে তোলে। সকলের—সমস্ত শ্রেণীর মুখের আবরণ তুলে ধরে তিনি তার দগদগে ঘা চোখের সামনে তুলে ধরেছেন—বলেছেন মানুষকে কি ভাবে আর কেন পশুর স্তরে নামিয়ে নিয়ে চলেছে; একটার পর একটা ঘা—যা পরবর্তী পরিণতিকে সহজেই মনের মধ্যে এনে দেয়।

যেমন ধরা যেতে পারে তাঁর 'লা-এসোম্মোনির' (১৮৭৭) বইখানাতে। পরিপূর্ণ শ্রমিক এলাকা এই বইখানা তুলে ধরেছে—তাদের দারিদ্র, তাদের হতাশা। কঠিন জীবন তাদের ঠেসে নিয়ে চলেছে ব্যভিচারের দিকে; মনকে সংযত করবার, দৃঢ় করবার ভিৎ তাদের নেই; শিক্ষার আলোক এখানে মনকে দৃঢ়পথে এগিয়ে চলার প্রেরণা জোগায় না; এখানে সহজে, আরামের লালসা আর জৈবীর তাড়নায় লোকে আসক্তিতে আচ্ছন্ন হয়—আর দারিদ্রের অভিশাপ ভুলতে গিয়ে মদের নেশায় নিজের শেষ পরিণতি অসম্ভাবীরূপে ডেকে আনে—যে পরিণতির জন্য দায়ী সমাজ, তার ব্যবস্থা; ধনিক শ্রেণীর বিলাস, তার শোষণ আর ব্যভিচার সমস্তই মহান নগরীকে টেনে নিয়ে চলে পঙ্কিল পথে—তার এক বিরাট অংশকে—আর এই পঙ্ক থেকে যা জন্ম হয় তা যেন স্বতঃসিদ্ধ; স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই জন্ম হয় 'নানা'। এই অন্ধকারময় জগৎ থেকে ক্লেদময় জীবন দিয়ে সে যেন সমাজের প্রতিটি স্তরের লোকদের পঙ্কের মধ্যে নামিয়ে আনে—তার প্রতিশোধ নেয়; বিরাট সংস্কৃতির ফাঁপা ক্লেদাক্ত জীবন সকলের সামনে তুলে ধরে—বিরাট দগদগে ঘা—যা কুষ্ঠের মত সারা শরীরে ছেয়ে রয়েছে।

এই নিষ্ঠুর চিত্র আঁকতে গিয়ে জোলা কোন' নৈতিক সংস্কারের ধানা ধরেন নি। লোকের তুষ্টির জন্য বা রেখে ঢেকে কোন কথা বলেন নি। নিতান্ত নির্ভীক ভাবে সচেতন মানুষের রূঢ় রূপটা সামনে তুলে ধরেছেন—সমাজের সংস্কৃতির প্রকৃত আর যথার্থ রূপ কল্পনার আড়ালে থেকে জনসাধারণকে সৌন্দর্যের অবতারণা করে বিভ্রান্ত করতে চান নি।

"নানার" এই পরিণতি—সমাজের এই বিভৎস ঘা স্বতঃসিদ্ধ পরিণতি হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে "লা-ডিবাকেল"এ (১৮৯১); এখানে ব্যক্তি গিয়েছে হারিয়ে, সমাজের মেরুদণ্ড গিয়েছে ভেঙ্গে—বিরাট সৈন্যবাহিনী, হতাশায়, বিভ্রান্ত হয়ে একবার অগ্রসর হচ্ছে আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে—উত্তেজনা নেই, নেতা নেই, দৃঢ়তা-আনবার লোক নেই—আদর্শ গিয়েছে ভূমিসাৎ হয়ে—বিভ্রান্তিতে করুণ আর্তনাদে তারা প্রমাণিত করেছে সমাজের বিরাট মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে।

অন্য বইগুলোতেও এমনিধারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চরিত্র তিনি এঁকেছেন—প্রতিটি শ্রেণীকে, যেমন "দি ফ্যাট্ এণ্ড দি থিন্।" একজন অতি শান্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক দেশের শোচনীয় অবস্থায় বৈপ্লবিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়, স্বজন থেকে আরম্ভ করে পরিচিত, অপরিচিত সকলে পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাকে নির্যাতন আর মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিল।

তেমনি আবার "লা-তের" (১৮৮৮) বইখানাকে কৃষক সম্প্রদায়ের দুর্নিবার লোভ, মাটীর

প্রতি তাদের লোলুপতা তাদের কোন নিম্ন স্তরে—চরম নৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে—পুত্র পুত্রবধূ বৃদ্ধ পিতাকে বাঁভৎসভাবে হত্যা করেছে—তারই চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। তেমনি ধরেছেন "জারমিন্যাল" বইখানায় খনির অন্ধকারময় শ্রমিকের জীবন ধারা—নীতি বলে যেখানে কিছুই নেই—একদিকে মালিকেদের লোভ আর ব্যভিচার—শোষণ—আর অন্যদিকে বংশ পরম্পরায় অন্ধকারময় খনির মধ্যে শুধু বাঁচার জন্য পশুর মত বেঁচে থাকা—সভ্যতার বাইরে, অনেক দূরে—যেখানে আলোক প্রবেশ করে না—ঘোড়াটা পর্যন্ত যেখানে মরবার আগে এই আলোকময় পৃথিবী দেখার জন্য ছট্‌ফট্ করে।

করুণ নারকীয় চিত্র—হয়তো জোলা ছাড়া বাস্তবকে এমনভাবে উদ্ঘাটিত করা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই কঠিন বাস্তবভঙ্গী শেষ পর্যন্ত তাঁর অন্যান্য বন্ধু বান্ধবেরা সহ্য করতে পারেন না। 'মাদাম বোভারীর' পর ফ্লবেয়ার আবার রোম্যান্টিক ধর্মী উপন্যাস লিখতে সুরু করেন। ম্যাথু আর্নল্ড মাদাম বোভারী থেকেই চিৎকার সুরু করেছিলেন—'ফরাসী উপন্যাস আর উপন্যাস নয়—এ বিজ্ঞান'। কিন্তু ফ্লবেয়ারের পর ডানকোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়—মোপাসা সকলেই জোলাকে ত্যাগ করে যান। নিঃসঙ্গ, একাকী জোলা তাঁর বৈপ্লবিক উপাখ্যান শেষ করে চলেন।

আ লো চ না

সমালোচনা ও সত্য

যখন সাহিত্যের সমালোচনা করতে যাই তখন যে সত্যবোধের ওপর নির্ভর করি তা একখণ্ড নয়, বহুখণ্ড। সত্য কথাটার মাত্র একটাই অর্থ নেই, আছে অনেকগুলো, পরস্পরনিরপেক্ষ অর্থ। বিভিন্ন সত্য কখনো মেলে কখনো বা মেলে না। না মিললে দুঃসহ সমস্যা। তাদের কী করে মেলানো যাবে সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। উপস্থিত দায় শুধু সমালোচকের প্রত্যয়ে সত্যের বিচিত্র রূপাবলীর নির্ণয়।

সত্যের প্রথম রূপ হচ্ছে তথ্য। গল্প পড়তে পড়তে হয়তো জানলাম সিকিমের রাজধানীর নাম গ্যাংটক, কিংবা লেখকের মতে গ্যাংটক শহরটা সুন্দর। যা জানা গেল তা সত্য হতে পারে, নাও হতে পারে। সত্য এখানে আর কিছু নয়, বর্ণনার বাস্তবানুগতা। কিন্তু গল্প পড়তে বসে আমাদের চাহিদা তথ্যের যথাযথতায় মিটবে না। অবশ্য এমন হতে পারে যে তথ্যের ভুল অন্য কোনো প্রকার সত্যচ্যুতির নিদর্শন বলে প্রতীত হচ্ছে। কিন্তু সেরকমটা না হলে তথ্যগুলো ঠিক কি নয় এ প্রশ্ন তুলবে না কোনো সুস্থমনা পাঠক।

সত্যের দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে স্বতঃসিদ্ধ বিধানজ্ঞান। বুড়োরা যে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল, অধ্যাপকরা যে প্রায়ই অন্যমনস্ক, এগুলো সত্য। এধরণের মানবচরিত্রজ্ঞানের সত্যমিথ্যা কিন্তু তথ্যের ওপর নির্ভর করেনা। কেউ গুণে দেখেনি শতকরা কজন বুড়ো কতখানি করে রক্ষণশীল। দেখার দরকারও নেই। এধরণের কথা বোঝা গেলেই সত্য, বোঝা না গেলেই মিথ্যে। বাস্তবিক যদি একটা বিশেষ বুড়োকে রক্ষণশীল বলে চিনি তাহলে এই বিধানজ্ঞানের জোরে তাকে বুঝতে পারব। কেন ও বুড়োটা রক্ষণশীল তার উত্তর খুঁজে পাব। বোধগম্যতাই সত্য। এধরণের সত্যকে তুলনা করা যায় জ্যামিতির সত্যের সঙ্গে। ত্রিকোণের তিনটে কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রী এ একটা সত্য। কিন্তু তাবলে কোনো বাস্তব করগমা ত্রিকোণ, কোনোদিন এবিধান পুরোপুরি মানেনি, মানবেও না।। এবং এমনও হতে পারে যে বিশেষ ক্ষেত্রে এমন এক জ্যামিতি উপযুক্ত হবে যাতে ত্রিকোণের তিনটে কোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রীর চেয়ে কম বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। এ ধরণের সত্য বাস্তবের বর্ণনা মোটেই নয়, শুধু বাস্তবের সম্পর্কাবলীর ধারণা। কিন্তু সাহিত্যকামী পাঠকের চাহিদা এতেও মিটবে না। মানবচরিত্র অধ্যয়ন গল্প বা কাব্য পড়ার এক-মাত্র হেতু নয়।

সত্যের তৃতীয় রূপ হচ্ছে অনুভূতি বা দৃষ্টির প্রকাশে সততা। অনুভূতি বা দৃষ্টিতে অপূর্ণতা থাকতেই পারে। সে অপূর্ণতাকে গোপন করতে যাওয়াই এখানে মিথ্যের অভিজ্ঞা। অনেক সময় লেখক লেখেন যদিও বলার কিছু নেই। লেখক লেখেন পেটের দায়ে কি রিরংসার ঠেলায় কি নাম কিনতে, অথচ দেখান যেন লিখছেন আনন্দ বা জ্ঞান বা বন্ধুতা বিতরণ করার সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে। পাঠককে ঠকানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ঠকানোও চলতে পারে। নিপুণ লেখক এরকম প্রবঞ্চনা এমনভাবে করতে পারেন যে ধরা সত্যিই কঠিন। সমালোচকের দুরূহতম শিক্ষা হচ্ছে এধরণের মিথ্যেকে চেনা ও চেনানো। সত্য এখানে সাযুজ্যনিষ্ঠা।

সত্যের চতুর্থ রূপ হচ্ছে কৌশলের সিদ্ধি। লিখতে যে শেখেনি এমন কোনো জন হঠাৎ কিছু লিখে ফেললে সেটা সাহিত্য না হবার সম্ভাবনাই বেশী। সে যা দিতে চাইছে তা পৌঁছবেই না পাঠকের কাছে। ইচ্ছে বা চেষ্টার সততার ওপর নির্ভর করলেই সিদ্ধি হয় না। কৃতির অংশ সমস্তটার সঙ্গে খাপ নাও খেতে পারে, বাছাইকরা রূপ অর্থের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। মিথ্যে এখানে কৌশলের অপূর্ণতা। কৌশল আর রূপসৃষ্টি এককথা নয়। বড় শিল্পী কখনো কখনো রূপের অপূর্ণতাকেও যথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারেন। হ্যামলেট নাটক তার উদাহরণ। সত্য এখানে সাযুজ্যকৃতি।

সত্যের পঞ্চম রূপ হচ্ছে প্রাচীনতম রসতাত্ত্বিক যাকে বলেছেন মোক্ষণ। অবদমিত দুঃখ, ভয় ও বাসনাকে কল্পনার মধ্যে প্রকাশ করে তাদের থেকে মুক্তি এনে দেয় যথার্থ সাহিত্য। বাসনা ইত্যাদি যে চলে যায় তা নয়, যায় তাদের অতিরেক, বিচ্যুতি ও দ্বন্দ্ব। সেইজন্যেই আনন্দ। আনন্দই সত্য। যদি কোনো সাহিত্যকৃতি চিত্তবৃত্তির মোক্ষণ না ঘটায়, যদি তাদের অতিরেক, বিচ্যুতি ও দ্বন্দ্বের বৃদ্ধি ঘটায়, তাহলে সে সাহিত্য মিথ্যে। সত্য এখানে লেখক ও পাঠক উভয়ের ওপরই নির্ভর, শুধু একজনের ওপর নয়। এই স্তরের আলোচনাতে সত্য একটা ঘটনার সম্ভাবনা এবং আনন্দের উৎস।

সত্যের ষষ্ঠ রূপ হচ্ছে কোনো বিশেষ রচনার সম্পর্কে লব্ধ তাৎপর্যফল। যদি জানতে চাই মহাভারত বা শেক্সপীয়ার পড়ে কী সত্য পাব, তারপর বাস্তবিক যদি তাদের থেকে কিছু পাই, তবে সে সত্য আমার নিজের মননের ভাষা হবে, জীবনের দিশারী হবে। সত্য হচ্ছে বাণী। সে বাণীর অস্তিত্ব আর যথার্থতা একেবারেই আলাদা নয়। যথার্থ নয় এমন কোনো বাণী পাওয়াই যাবে না। এ ধরণের সত্যের প্রকাশ শুধু ব্যক্তিগত জীবনবোধ ও জীবননিষ্ঠার সম্পর্কে। তাবলে যে সাধারণ্যে তার আলোচনা হতে পারবে না তা নয়। মহাভারত ও শেক্সপীয়ার তো অনেকের জীবনেই সত্যের উৎস। রবীন্দ্রনাথের রামায়ণব্যাখ্যাও স্মরণীয় উদাহরণ। সত্য এখানে সত্তা-বোধের আশ্রয়।

কোনো একটা সাহিত্যকৃতি বিচার করতে বসলে সত্যের প্রশ্ন ওঠে বিচিত্র রূপ নিয়ে। বিভিন্ন সত্য কখনো মিল খায়, কখনো মিল খায় না। সমালোচনার কাজ তাই সহজ নয়। *

পুণ্যশ্লোক রায়

সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা

মানব সত্যতার ইতিহাস ও তার গতিপ্রকৃতি যখন আমরা আলোচনা করি তখন দেখি মানুষ তার ইতিহাসের বহু অধ্যায় আত্ম অসংজ্ঞাত অবস্থায় কাটিয়েছে। তার নিজের ব্যক্তিত্ব সমাজের স্রোতে ভেসে চলছিল, সে কখনও তাকে পরখ করে দেখেনি। সে সমাজের গতিপ্রকৃতির নিয়ামক না কোন অদৃশ্যসত্তা, তাও তার বিবেচ্য ছিলনা। ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বা ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক এ নিয়ে সে মাথা ঘামায়নি। কথাটার সত্যতা প্রমাণের জন্য আমাদের বেশীদূর যেতে

* কোয়েস্ট পত্রিকার 'প্রত্যয় ও সাহিত্য' সেমিনারে পঠিত ইংরেজী ভাষণের লেখক কর্তৃক ঈষৎ পরিমার্জিত অনুবাদ।

হবেনা। ধর্মকে জীবনের একমাত্র মাপকাঠি করে, আমরা যে মানবতার তূর্যধ্বনি তুলেছিলাম সেত মানুষবিহীন এক মানবতার অলীক রাজ্য — আধুনিক যুগে এই খৃষ্টধর্মরাজ্য বা হিন্দু-সত্যযুগের এক বিক্ষিপ্ত প্রকাশ টলষ্টয়, রাস্কিন বা মহাত্মা গান্ধীর জীবন নীতিতে। রাষ্ট্রনীতিতে বা সমাজ জীবনে এঁরা যে স্বপ্ন দেখলেন, দর্শনরাজ্যে আমাদের শংকরাচার্য, প্ল্যাটো, স্পিনোজা সেই স্বপ্ন দেখলেন তাঁদের নির্গুণব্রহ্মে। সুখের বিষয়, প্ল্যাটো থেকে সুরু করে এসব স্বপ্ন-বিলাসীদের যুক্তিকে মানুষের জীবনধর্ম বাতিল করে দিয়েছে। ইতিহাসবিজ্ঞরা বলেন মানুষ তার নিজস্ব স্থিতি, সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল রুশোর সাধারণ অভীপ্সার (জেনারেল উইল) মাধ্যমে। প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে রেনেশাঁস যুগের মানবতার মধ্যে আমরা পাই গ্রীক পরীক্ষাশীলতা, বাণিজ্য প্রসারের জন্য ব্যক্তিগত দুঃসাহসিকতা ও খৃষ্টান সভ্যতার উত্তরাধিকার। নিঃসন্দেহে উহা মানুষকে আত্মসচেতন করে তুলেছে অনেক। কিন্তু রুশোর মানবতাবাদে মানুষকে সহজভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে—এখানে আধিদৈবিকতার বিশেষ কোন দাম নেই যদিও জানি রুশো তাঁহার সাধারণ অভীপ্সার অবস্থিতি কোথায় নিজেই ঠিক করে উঠতে পারেন নি। অবশেষে এই ভাসমান সাধারণ অভীপ্সার অভিশপ্ত আত্মা প্রখ্যাত দার্শনিক হেগেলের রাষ্ট্রদর্শনে প্রজ্ঞানের মূর্ত প্রতীকরূপে রাষ্ট্রকে দেহরূপে লাভ করল। কিন্তু ফল হল এই রাষ্ট্র হল প্রজ্ঞানের মুক্তি অভিযান, তাতে ব্যক্তির রইলনা কোন মান—একেই ডিউই বলেছেন—'deliumanisation of thougtht' দর্শনকে আজ যারা মায়াকাজল স্বপ্নমেদুর মন্দির থেকে সরিয়ে এনে মানুষের জীবনে প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন, তারা প্রাগম্যাটিষ্ট, তারা Protagorus 'Homo men sura' অর্থাৎ মানুষই সকল সত্যের নিয়ামক এই বাণীর বাহক।

আধুনিক যুগ ব্যক্তিচেতনার যুগ, ব্যক্তিমানব আজ সমাজে তার আসন কতটুকু, ভবিষ্যৎ সমাজের সংগঠনে সে কি ভূমিকা অর্জন করতে পারে, এ নিয়ে নানা সমস্যার সোপান সৃষ্টি করে—নতুন দর্শন সৃষ্টি করে—নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে। সমাজ ত একটি কৃত্রিম কাঠামো নয়। মানুষ জন্মে সমাজে, বাঁচে সমাজে, মরে সমাজে। ম্যাকাইভার চমৎকার ভাষায় বলেছেন ঃ

"Society exists only as a time sequence. It is becoming, not a being; a process, not a product."

সমাজ তো কোথাও স্থানু হয়ে নেই; কালের ধ্বংস থেকে ওকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আমরা ওকে যাদুঘরে রাখতে পারি না। সমাজ সদা বহমান একটি জীবন্ত প্রাণ। কোন দেশ যদি সমাজকে সকল পরিবর্তনের আবর্ত থেকে পাহারা দিয়ে স্থানু করে রাখতে চায়, তবে সে সমাজের শবদেহ আশ্রয় করে থাকে।

সমাজকে যখন গতি বলে আখ্যাত করেছি তখন একটা কথা পরিষ্কার করা উচিত। গতি মানেই কি প্রগতি? গতি মানেই শুধু পরিবর্তন নয়, একটা চিরন্তন ধারা; যদিও একে আমরা পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ গতি বা পরিবর্তন কি প্রগতি? বিবর্তন ধারায় চলেছে বিশ্বের সকল শোভাযাত্রা। মানুষ যখন এতে সক্রিয় হয়ে উঠে, তখন তার একটি উদ্দেশ্য থাকে এবং এজন্য গতিকে সে উদ্দেশ্যের দিকে প্রধাবিত করতে চায় পরিবর্তন যদি সে উদ্দেশ্য লাভ করে, তবে মানুষ সে পরিবর্তনে পায় নূতন মূল্য—সুতরাং সকল পরিবর্তনের সে মূল্যায়ন করে। আর মূল্যবোধেই প্রগতি। বাহ্যিক জীবনের সকল আড়ম্বর তার কাছে নিরর্থক হবে যদি সে জীবনের 'মান'কে হারায়। মানবাদী বলেই মানুষ মানুষ। স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী এই বাণীর ধ্বনি নিয়ে ফরাসী বিপ্লব সুরু হল, আর তার তের বৎসর পর তার যবনিকাপাত হলো নেপোলিয়নের একচ্ছত্রাধিপতি উপাধি লাভে। সেদিনকার ফরাসী সমাজ গতিশীল ছিল,

বিপ্লবের সুর একেবারে ব্যর্থ হয়নি, তবুও আমরা বলব, সেটা প্রগতি থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, অন্ততঃ সে সময়ের জন্য। অতএব দেখা যাচ্ছে সকল প্রগতিই পরিবর্তন কিন্তু পরিবর্তন মানেই প্রগতি নয়। আমরা যখন সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব, তখন বুঝব ব্যক্তি সমাজ প্রগতিতে কতটুকু অংশ গ্রহণ করে।

কিন্তু এ ব্যক্তিত্ব কি? এই ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। দর্শন, মনোবিদ্যা, জীববিদ্যা, নানাদিক থেকে এ 'ব্যক্তিত্বকে' ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু সমাজ তত্ত্বে আমরা ব্যক্তিত্বকে বস্তুনিষ্ঠ বলে বিবেচনা করি। ব্যক্তিত্ব বলতে একটা নিছক সুন্দর আচরণ বা সুন্দর দেহগঠন, বা কর্মপ্রতিভা বুঝায় না। যদিও এগুলি ব্যক্তিত্বগঠনে সাহায্য করে। প্রত্যেক মানুষেরই (সাধারণ বা অসাধারণ) কিছু না কিছু ব্যক্তিত্ব রয়েছে। সমাজতত্ত্বে আমরা ব্যক্তিত্ব বলতে বুঝি সমাজে মানুষের সকল আচরণ যা এককে অপরের থেকে পৃথক করে—যা ব্যক্তিকে ব্যক্তির মান বা মর্যাদা বা অর্থ প্রদান করে এক কথায় ব্যক্তিত্ব সামাজিক সকল জটিল সম্পর্কের নিত্য নূতন প্রাণসঞ্চারী বস্তু—সামাজিক মান আর ব্যক্তিত্ব ওতপ্রোত ভাবে জড়িত—ব্যক্তিত্ব একটি 'Unique creative novelty.' সমাজ প্রগতির ইতিহাস ব্যাখ্যানে সাধারণতঃ দুটো মত-বাদ বর্তমান। একটি হলো ঃ নিয়তি যার রূপায়ন ঘটে বিরাট ব্যক্তিত্বে বা বীর পুরুষে অন্যটি হলো ঃ ব্যক্তির আপন অন্তর নিহিত ক্ষমতার বিকাশ। প্রথমটির মতে প্রগতিতে অন্ধ নিয়তির হাতছানি রয়েছে, এখানে ইচ্ছা স্বাতন্ত্র বা ব্যক্তিমানুষের অভীপ্সার কোন দাম নেই। অন্যটির মতে ব্যক্তিমানুষের কর্মক্ষমতা ও স্বাধীনতাই বড় কথা। শ্রীঅরবিন্দ বলেন এ দুয়ের বিরোধ সত্য নয়। ব্যক্তি মানুষের ইচ্ছাস্বাতন্দ্র ও নিয়তির মধ্যে আসলে কোন দ্বন্দ্ব নেই এ দুইই অদৃশ্য বিশ্বসত্তা বা বিশ্বশক্তির দুটো ধারার প্রকাশ—একটি আর একটির পরিপূরক। শ্রীঅরবিন্দ আরোও বলেন সমাজ প্রগতির আদর্শ নিয়ম ব্যক্তি, জাতি ও মনুষ্যত্বের একটি সুসমঞ্জস বিকাশের উপর নির্ভর করে। এদের প্রত্যেককেই নিজের ভেতরকার শক্তির স্ফূরণ করতে হবে আর অন্তর নিহিত স্বাধীনতার দ্বারা ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণ করা চাই দিব্যশক্তিকে (দি ডিভাইন) লাভ করবার জন্য।

আমাদের গীতা শাস্ত্রে 'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি' বলে যে শ্লোকটি আছে উহাতে নিয়তি বা বিরাট পুরুষাকারের উপরই সমাজ প্রগতি নির্ভর করে এ ইংগিত রয়েছে। প্ল্যাটো তার 'দার্শনিক রাজার' উপরই সমাজের গতিকে ছেড়ে দিয়েছেন। ষ্টচ সাহেব বলেন ঃ 'History is a sound aristocrate.' কার্লাইল পুরোপুরি বিরাট পুরুষাকারের ভক্ত। কাণ্টের মতে নিয়তিই বড় কথা। ব্যক্তির ভূমিকাত কিছুই নেই। হেগেল তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যানে 'যুগ-পুরুষ'কে প্রজ্ঞানের একমাত্র বাহক বলে ধরে নিয়েছেন। ওদেরও নিজস্ব এমন কোন কৃতিত্ব নেই। তারা শুধু প্রজ্ঞানের (এ্যাবসলুট) অবধারিত গতি সাধারণ ব্যক্তির চাইতে বেশী বুঝেন।

স্পেংগলার, সরোকিন এঁরা সমাজে একটি গতিচক্র বর্তমান, এ বিশ্বাস করেন। স্পেংগলার বলেন ঃ সমাজে পূর্বপরিকল্পিত একটি সমাজ-জীবন-চক্র বর্তমান এবং ওটাকে আমরা জীবদেহের সংগে তুলনা করতে পারি। সরোকিনও বলেন এ গতিচক্র আমাদের জীবন যাত্রাকে ঠেলে নিয়ে চলছে, তবে ওটা জীবদেহের মত কোন প্রান্তে এসে দাঁড়াবেনা। ওটা মৃত্যুর পথে এলেও আবার নতুন হয়ে জন্মাবে। আসল কথা এ সমস্ত সমাজবিদের দৃষ্টিভংগীতে বর্তমান যুগব্যবস্থা নিন্দিত হয়েছে, ধিকৃত হয়েছে, তাঁরা নব্যসমাজের আশা করেন—যাহা একটি পূর্ণ আদর্শ সমাজ (হয়ত অতীতে ছিল বা এখনও অনাগত) যাহা সকল ত্রুটিবিচ্যুতি বিমুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Personality & Creativeunity' বইতে বলেছেন ঃ প্রত্যেক মানুষের ভেতরে রয়েছে একটি জৈবিক মানুষ আর একটি ব্যক্তিমানুষ (পার্সোনাল ম্যান)। প্রথমটি ক্ষুধাতৃষ্ণার

তাড়নায় সদাব্যগ্র, শেষেরটি এসবের উর্ধে সীমার বাঁধনে ওকে ধরা যায় না। ব্যক্তিত্ব অসীম—আর সমগ্র বিশ্বইতো এই সসীম মানুষটির অসীম ব্যক্তিত্বে ধরা পড়ে। সমাজ প্রগতি, ব্যক্তির প্রগতির উপর নির্ভর করে অর্থাৎ জৈবিক ব্যক্তির ভোগ বাসনা ত্যাগের ফলে—এখানে 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' প্রখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবি এ ধরনের না বললেও বিশ্বাস করেন মানুষ তার পরিবেশের উপরে উঠতে পারে এবং তার কর্মক্ষমতা সমাজ যে আমূল পাল্টাতে পারে। মানুষ তখন হয়ে উঠবে 'সুপারম্যান' একে আমরা রবীন্দ্রনাথের পার্সোনাল ম্যান এর সংগে তুলনা করতে পারি।

মানুষের ইতিহাসে শেষ অধ্যায় বলে কিছু আছে কিনা তা নিয়ে তর্ক বর্তমান। হেগেল মার্কস কোঁৎ এ'রা বলেন আমাদের সমাজে গতি এক যায়গায় এসে দাঁড়াবে, আর তখন হবে ওটা পূর্ণ সমাজ। কিন্তু বিনয় সরকার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, গিডিংগস, ম্যাকাইভার এ শেষ অধ্যায়কে মেনে নিতে পারেন না। বিনয়কুমার সরকার প্রগতি বলতে মনে করেন অন্ধকার আলো, সৎ-অসৎ, বিদ্যা-অবিদ্যা, মৃত্যু অমৃত্যু-এগুলির একটি চিরন্তন ও সৃজনশীল অসাম্য বা অসুস্থিতি (Creative disequilibrium)। পরিপূর্ণ প্রগতি বলতে কিছুই সম্ভব নয়। গিডিংগস তাঁর 'moving disequilibrium' তত্ত্বে একথাই বলতে চেয়েছেন। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে দেওয়া নেওয়ার একটা চিরন্তন সম্পর্ক রয়েছে; এ সম্পর্কে অভিধানে বিরতি বলে কোন শব্দ নেই। ব্যক্তি হলো একটি শলতে, সমাজ তেল শলতে আর তেলে আলো জ্বলে। সমাজ আর ব্যক্তি মিলে মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। ওরা উভয়েই সৃজন ধর্মী এদের সৃষ্টিই হচ্ছে প্রগতি। গিডিংগস্ একথাকেই অন্যভাবে বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে মানুষের ব্যক্তিত্ব নিঃসন্দেহে সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারার ফল। কিন্তু একথাও সমভাবে সত্য যে মানুষের ব্যক্তিত্বের দান সমাজ প্রগতিতে অপরিমেয়।

সরোকিন চার ধরণের প্রতীক ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচন করেছেন। প্রথম ব্যক্তি হল কালচার আইডিয়াশোনাল সে সত্তা ও মূল্যবোধকে ইন্দ্রিয়াতীত অতিপ্রাকৃত বলে বিশ্বাস করে, সে সে অন্তর মুখী, নৈতিকতায় সে পরমবাদী। সমাজ প্রগতিতে তার কোন বিশ্বাস নেই সে অন্তর প্রকৃতির রাজ্যে মগ্ন। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব হলো ঃ কালচার সেনশেট সে কর্ণমুখর, হামলাবাজ, বহির্মুখী। অতীন্দ্রিয় বলে কোন কিছুই তার কাছে নেই। নীতিশাস্ত্রে, কলাশাস্ত্রে সর্বত্র সে উপযোগী। তৃতীয় স্তরের ব্যক্তিত্ব হল কালচার আইডিয়ালিস্ট, সে উপরের দুইস্তরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখবার চেষ্টা করে। যে সমাজে এসব স্তরের মানুষের প্রাদুর্ভাব বেশী সে সমাজ গভীরভাবে উন্নত। প্রথমস্তরের মানুষ বিশ্বাস প্রবণ হয়ে বাস্তব বিমুখ হয়ে উঠে। দ্বিতীয় স্তরের মানুষ ইন্দ্রিয়কে এত বড় দেখে যে জীবন থেকে সকল আদর্শ বাদ দিয়ে সে ভোগবাদী বিপ্লববাদী (ধ্বংস করার বিশেষ মনোবৃত্তি অর্থে) হয়ে উঠে। চতুর্থ স্তরের ব্যক্তিত্ব হলো কালচার ইসিলেকটিক ঃ সে সাতেও নেই পাঁচেও নেই, অন্তর শক্তিতেও সে বিশ্বাস করেনা, সমাজ প্রগতিতে তার মাথা ঘামানোর অবসর নেই। এধরণের ব্যক্তিত্ব যত বেশী দেখা যায়, সমাজের অধঃপতন তত নিশ্চিত।

আলোচনান্তে আমরা এটুকু বলতে চাই সমাজে ব্যক্তির ভূমিকার কোন পরিসীমা নেই। বিরাট ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিমাত্র; ওটাকে আমরা অবতার বা অতিপ্রাকৃত বলে ভুল বুঝি। এবং এর ফলে সাধারণ আপামর মানুষ সম্বন্ধে আমাদের একটা অহেতুক অবজ্ঞা। আসল কথা প্রত্যেক মানুষ তার চলনে বলনে মননে সংজ্ঞাত অসংজ্ঞাত অবস্থায় সমাজের কাঠামোকে বজায় রাখছে। আজকের গণতন্ত্রও এবিশ্বাস করে। অন্ধ নিয়তি বা ব্যক্তিক কর্মের আকস্মিকতা প্রভৃতি ধারণা মোটেই

বিজ্ঞানসম্মত নয়। আজকে নব্য সমাজ দর্শন বা মানবতাবাদ মানুষকে বহু সম্ভাবনার উত্তরাধিকারী করার বাণী নিয়ে এসেছে—মানুষ সম্বন্ধে সনাতন কোন সত্য নেই, নিত্য নতুন সৃষ্টি ধর্মিতায় চলেছে মানুষের লীলা যা নিত্য তাকেও সে নূতন ভাবে পেতে চায়। মানুষ সামাজিক জীব—সমাজ তারই সৃষ্টিশীলতায় প্রাণ পায়। একথাকে স্বীকার করা চাই, তা না হলে আজকের নব্য সমাজের সকল প্রস্তুতি ও প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হবে।

ঋতেন্দ্রকুমার রায়

অথ ষ্টেট বাস কথা

আপনি কি কোথাও যাবেন বলে চিন্তা করছেন? মানে বালিগঞ্জ কি শ্যামবাজার, হাওড়া কিম্বা শিয়ালদহ? বাসে যাবেন ত? দামী সরকারী বাসে গদী আটা নরম সীটে আরামে বসে যাবেন বলে ভাবছেন? একটু তাড়াতাড়ি যাবার দরকার বোধহয়?

খুবই চিন্তার কথা সন্দেহ নেই। আপনার আমার মত ছাপোষা লোক, কলকাতায় বসে কোনওখানে তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা চিন্তা করি যখন, তখন কপালটা আপনা থেকেই কুঁচকে যায় বিরক্তিতে। হাতে বেশ সময় নিয়ে বেড়িয়েছেন যাতে ঠিক সময়ে পেঁাছাতে পারেন। অভ্যাসমত স্টপে দাঁড়ালেন। কিন্তু আপনি জানেননা কখন আকাঙ্খিত বাসটি আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে। কন্ডাক্টর, ড্রাইভার, স্টার্টার—কেউই জানেননা, যদি বা বাস এল আপনার সময়ের অনেকখানি খরচ করে—দেখলেন 'ঠাঁই নাই'। অবশ্য যদি আপনার তিনকুলে কেউ না থাকেন, গম, ছোলা, এ ও ডি ভিটামিন যুক্ত বনস্পতি খেয়েও বাহুবল ও মনোবল অটুট থাকে, যুযুৎসুতে পটুতা থাকে, যদি শরীর আপনার অসাধারণ নমনীয় হয় এবং জামা কাপড়ের মায়া না থাকে তাহলে আপনি হয়ত একটা পা মাড গার্ডে ও একটা হাত দরজার আগায় আটকে পতাকার মত চলে যেতে পারেন আপনার লক্ষ্যে।

আপনি সরকারী বাসে যাতায়াতের বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করেছেন, সুতরাং সরকারী বাসের অন্দরমহলে আপনার প্রবেশ নিষেধ নয়। যাত্রী নামার স্রোত এড়িয়ে ওঠার স্রোতে গা ভাসিয়ে বিনা আয়াসে ভিতরে চলে যাবেন। আবার নির্দিষ্ট জায়গায় নামার স্রোতে গা ভাসিয়ে নীচে নেমে মাটিতে পা ঠেকাবেন।

মুস্কিল হয় বাঁচবার সংগ্রামে জর্জরিত দুর্বল মানুষগুলোর। সকালে কোনও রকমে নাকে মুখে গুজে তাড়াতাড়ি স্টপেজে এসে দাঁড়ান সরকারী বাসের প্রতীক্ষায়। অনেক পরে দৃষ্টিপথে আসে মানুষভরা উপছেপরা বাস। বেশী আশা তাঁরা করেন না—শুধু ফুটবোর্ডে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল রাখার অল্প একটু জায়গা! তাঁদের আশায় ছাই দিয়ে সরকারী বাস ধুলো উড়িয়ে চলে যায় নাকের উপর দিয়ে। আবার অপেক্ষা করেন পরের বাসের জন্য। কাঁটাত ঘুরে চলে, আজও দাগ পরে যাবে হাজিরা খাতায়। কিছুক্ষণ পরে বাস এসে দাঁড়াল। কোনও যাত্রী হয়ত 'চাপড়' মেরেছেন বাসের গায়ে—কি করবেন, ঘণ্টার দড়ি নেইযে, কাকে বলবেন, কন্ডাক্টরকে যে দেখা যাচ্ছে না! যাইহোক বাসটি দাঁড়ায়। যাত্রী ভদ্রলোক অনেক কায়দা করে মাথাটা কারুর বাঁ হাতের নীচে গলিয়ে, দুটো লোকের মাঝে কাত হয়ে, ভাঁজ হয়ে ও আরও অনেক কঠিন ভঙ্গী করে কোনও রকমে বেড়িয়ে এলেন হয়ত। কিন্তু বাস দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই জনতার চাপ পেঁাছে

যায় দুই দরজা ঘিরে। যাত্রী ভদ্রলোক নেমে এসেছেন ঠিকই। কিন্তু চাপে ওঁর ছোটব্যাগটা হাত সমেত আটকে গেছে ভীড়ের মধ্যে। একজনের জায়গায় দশজন উঠবেন। এতক্ষণে জমাকাপড়, সযত্নে পালিশ করা জুতো সবেরই ছিড়িছাঁদ গেছে। ভ্যাপসা গরমে শরীর নিঃসৃত ক্লেদ ভাগাভাগি হয়ে গেছে সবারই মাঝে। একজন আর একজনের জুতার উপরে মেঝে ভেবে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছেন টিনের বিস্কুটের মত থাঁজে থাঁজে। নড়বার বা বলবার একটুও উপায় নেই, বললেই ট্যাক্সী দেখিয়ে দেবেন। যদি কোনও ভাগ্যবতী আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে উঠতে পারেন তাহলে নানারকম টীকা টিপ্পনী শোনার ভাগ্যও তরি থাকবে। কারণ সরকারী বাস ত কেবল সক্ষম পুরুষদের জন্যে। অবশ্য সরকারী বাসের লেডীস সীট বেশ সুরক্ষিত। যাতে ধুলো, বালি, হাওয়া না লাগে সেইজন্য বেশ বড় স্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে ঘেরা। রোদটাও উপভোগ করতে পারেন মহিলারা।

সরকারী বাস কর্মীদের সৌজন্যের খ্যাতি নাকি আছে। চৌরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন হয়ত ২নং বাসের জন্যে। দেখলেন পর পর দুটো দোতলা বাস আসছে। জানেন না কোনটা কোন রুটের। কাছে এসে দেখলেন সামনেরটা তিন, পিছনেরটা দুনম্বর। তিন নম্বর আড়াল করে দাঁড়ালেন আপনাকে। তিন নম্বর দু নম্বরের ডান দিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলেন। দুনম্বরের ড্রাইভারের প্রয়োজন কী লক্ষ্য করার যে আপনি স্টপেজে দাঁড়িয়ে আছেন? আপনি যে ঐ বাসটির জন্যেই দাঁড়িয়ে আছেন তাত ওঁর জানার কথা নয়। এসপ্ল্যানেডে ৯নং, ১৪নং রুটের বাস ঠিক কোনখানে দাঁড়ায় বলতে পারেন? ২, ৩, ৪, ৫নং রুটের বাসের জন্যে শেড আছে। আর অন্যদের কিছু নেই। অতএব ৯নং, ১৪নং ঠিক কোথায় দাঁড়াবে তারও কোনও নিয়ম নেই। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন এক প্রান্তে ৯ বা ১৪ নং বাসের জন্যে দেখলেন অন্য প্রান্তে ৯ নং বা ১৪ নং এসে দাঁড়িয়েছে। ছুটলেন তাড়াতাড়ি ধরবার জন্যে। কিন্তু ততক্ষণে কন্ডাক্টর বাসের গায়ে চাপড় মেরেছে। অতএব যাত্রী থাকলেও চালক মহাশয় দাঁড়াবেন না। হয়ত এরকম থামার নিয়ম নেই। আপনার চিরকালের অভ্যাস এক রুটে যাতায়াত করার। হঠাৎ একদিন দেখলেন সে রুটে থেকে সব সরকারী বাস উধাও হয়েছে। কারণ কিছু জানেন? কারণ জানানোরও নিয়ম নেই। সরকারী আদেশ। নড়চড় হবার উপায় নেই। আপনাদের অসুবিধে হচ্ছে, তা একটু হলই বা। এমনি কত অসুবিধেই ত আছে। যাত্রীদের সুবিধা! আপনাদের ওঠানামার দিকে না তাকিয়ে ছাড়বার সঙ্কেত দিতে অসুবিধা কোথায়? ঘন্টা ত বেজে গেল—আপনি বাসকে তাড়া করে শারীরিক পটুতার পরীক্ষা দিয়ে উঠুন। কন্ডাক্টর আর আগের মত ঘোষণা করতে লজ্জা পান বাসটি কোথায় এল বা কোথায় যাবে। যাইহোক ভাগ্যক্রমে বাসে যখন উঠতে পেরেছেন তখন ভাড়াটা হাতে রাখবেন। কারণ ভাড়া চেয়ে হয়ত কেউ আপনাকে বিরক্ত নাও করতে পারেন। যখন নেমে যাবেন তখন লাজুক কন্ডাক্টরের হাতে ভাড়াটা গুঁজে দেবেন। তবে মাটিতে পা দেবার আগে পিছন দিকে তাকিয়ে নামবেন। আজকাল রাস্তার মাঝে দাঁড়ানোই সরকারী বাসের নিয়ম। যদি না দেখেন তাহলে পিছনের গাড়ী আপনাকে চিরকালের জন্যে অচল করে দিতে পারে। আপনার জান ও মালের উপর আপনাকেই নজর রাখতে হবে। এসবের জন্যে সরকারী বাস ড্রাইভার, কন্ডাক্টরের কোনও দায়িত্ব নেই। টিকেট চেয়ে আর লজ্জা দেননি নিশ্চয়ই। সত্যিই দেখুন ত এই ভীড়ের মধ্যে টিকিট কি করে আপনাকে দেবে?

এত নিয়ম অবশ্য আপনার জানার কথা নয়। তবু যদি না জানেন তাহলে নিজেকে স্মার্ট বলে আর পরিচয় দেবেন না। আপনি সরলমনে ভাবছেন যে এত ভীড় তবু বাস বাড়ছেনা কেন? কি করে হবে বলুন এত সৌজন্যবোধ থাকলে? লাভের বদলে ক্রমাগত এত লোকসান

দিয়ে সরকার কাঁহাতক আপনাদের বয়ে নিয়ে বেড়াবে? আর তাছাড়া কলকাতায় এত গাড়ী বেড়েছে যে আর কটা বাস ছাড়লেই সব জট পাকিয়ে যাবে। মাটি না খুড়লে আর উপায় নেই—মানে সুরঙ্গ দিয়ে ট্রেন চালিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাদের চলাচলের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করছেন সরকার।

এত সবই গেল সবই আপনার একার কথা। কিন্তু যদি একজন মহিলা বা শিশুরা কেউ সঙ্গে থাকেন? যদি সপরিবারে আপনার যাওয়ার কথা থাকে কোনও সামাজিকতা রক্ষা করতে বা কোনও মুমূর্ষু রোগীকে দেখতে? তাহলে আপনার মাথাটা হয়ত একটু গরম হয়ে উঠবে। আপনার 'সপরিবার' হয়ত অকারণেই ধমক খাবেন। কারণ নিয়ে যাবেন কিসে? সেই দামী গদীমোড়া সীট ওয়ালা সরকারী বাসে ত? অনেক সাধনার পর যদি ঝুলন্ত যাত্রীদের অনুগ্রহে যদি সপরিবারে বাসে উঠতে পারেন তাহলে প্রাণে হয়ত বাঁচলেন কিন্তু যখন নামলেন তখন জানলেন মান নয়ত মাল ঐ বাসেই রেখে এসেছেন।

আপনার অসুবিধের কথা জানাবেন কাকে? আপনি জানেন না যে বড় বড় মাথা আপনার জন্যে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন। আপনার ক্ষীণ স্বর তাঁদের শীততাপনিয়ন্ত্রিত কামরায় পৌঁছাবেনা। যদি বেশী গোলমাল করেন পরিসংখ্যানের ধাঁধা আপনার সাধারণ বুদ্ধির সামনে হাজির হয়ে যাবে। আর তাছাড়া এ অসুবিধে ত গা সহা হয়ে গেছে আপনার। সুতরাং সব নিয়মের মধ্যে "সারাভাইভাল অফ্ দি ফিটেস্ট্" নিয়মটা মনে রাখলে আপনার আর অসুবিধা হবেনা বোধহয়।

নির্মলেন্দু সান্যাল

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

নট-নাটক ও নাট্যকার

সংস্কৃত আলংকারিকরা নাটককে বলেছেন দৃশ্য কাব্য। অর্থাৎ নাটকের সাহিত্যগুণে থাকবে এবং তা দর্শনীয় হবে। দুটির একটি অনুপস্থিত থাকলে নাটকের নাটকত্ব ক্ষুন্ন হবে। নাটকে সাহিত্য গুণ আরোপ নাট্যকারের কর্তব্য আর তাকে দর্শনীয় করা নটের কাজ। এখন প্রশ্ন উঠছে, নাটকে কোনটি প্রধান তার সাহিত্য মূল্য না তার অভিনীত রূপ? অল্প কিছুদিন ধরে এসম্বন্ধে বাঙলা নাট্যশালার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরস্পরবিরোধী মতামত পড়ে এ সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসার জন্য আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছি।

অন্য কথা বলার আগে নাট্যকার মূলে কি তা জানা দরকার। নাট্য সাহিত্যে যাঁদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তাঁরা এবিষয়ে একমত যে, নাট্যকর মূলে হল দ্বন্দ্ব। এদ্বন্দ্ব ঘটনাজ হতে পারে, মানসিক হতে পারে, সৎ অসৎ গুণাবলীর হতে পারে আবার দুর্দম প্রকৃতির সঙ্গে মানবের হতে পারে। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে প্রকৃতির অমোঘ অলঙ্ঘনীয় গতি সম্বন্ধে দর্শকরা সম্পূর্ণ অবহিত, তারা জানে শেষ পরিণতি কি দাঁড়াবে কিন্তু তবু বিরূপ ভাগ্যের সঙ্গে আত্মশক্তিতে বলীয়ান মানুষের অসমান যুদ্ধ তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখে।

নাটকে সাধারণতঃ এই দ্বন্দ্ব কি ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব তাই নিয়েই পরীক্ষা চালানো হয়। কোন নাট্যকার ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নিয়ত চলমান ঘটনা প্রবাহে দ্বন্দ্বটা সম্পূর্ণ করে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলেন। কেউ আবার মনোবিশ্লেষণের রীতিতে অন্তর্দ্বন্দ্বকে পরিস্ফুট করেন। কিন্তু সত্যকার শক্তিমান নাট্যকার বহির্দ্বন্দ্ব আর অন্তর্দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু সমাবেশ ঘটিয়েই কালজয়ী রচনা করেন। সেক্সপীয়রের নাটক যে আজও এত সমাদৃত তার একমাত্র কারণ তাঁর নাটকে এই দুই দ্বন্দ্বের সর্বাধিক সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখা যায়। হ্যামলেট শুধুই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করতে গিয়ে মর্মান্তিক অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত নয়, বাইরে থেকে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে সে বিধ্বস্ত তাই তার জীবনের ট্র্যাজেডিও নিতান্তই স্বাভাবিক।

তাহলে নাটকের গঠনই কি তার প্রধান অঙ্গ? সুগঠন যে নাটককে সুসমঞ্জস করে তা অনস্বীকার্য সত্য কিন্তু তাই কি সব? সুন্দরী মেয়েটি বা সুন্দর বস্তুটি ক্ষণিকের জন্য মনকে উন্মনা করে, কিন্তু চিরদিনের মত কি আকর্ষণ করে রাখতে পারে? পারে না যে একথা বলার অপেক্ষা করেনা। মানুষ রূপের বাইরে রূপাতীত কিছু একটা চায়, তাই কবি কালো মেঘের কালো হরিণ চোখ দেখেই মুগ্ধ বিস্ময়ে কাব্য সৃষ্টি করতে পারেন, যক্ষ তার তন্বীশ্যামা শিখরি দশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠি প্রিয়ার জন্য বিরহ যাতনায় কাতর হয়ে পড়েনা।

তবে কি নাটকের সংলাপই তার মুখ্য উপকরণ? তাহলেও যাঁর ভাষা যত সুললিত তিনি তত বড় নাট্যকার হতে পারতেন। পৃথিবীর বহুবিখ্যাত কবিদের অতি স্বল্পাংশেই নাট্যকার খ্যাতি লাভ করেছেন, তাও যাঁরা নাট্যকার খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁরা মূলতঃ নাট্যকারই; কবি তাঁরা নিতান্তই অবশ্য বিপাকে। সেক্সপীয়ার কালিদাসের কথাই ধরা যাক। এঁদের

দুজনকার কবি খ্যাতি যুগ যুগান্তরের পারে আজও অম্লান হয়ে আছে। কিন্তু নাট্যকার হিসাবে তাঁদের খ্যাতি কবি খ্যাতিরও ঊর্ধে। কালিদাসের সঙ্গে শকুন্তলা প্রায় অভিন্ন হয়ে উঠেছে; কুমার সম্ভব বা মেঘদূতের সঙ্গে তিনি অতটা একাত্মা নন। সেক্সপীয়ারের রচনার উল্লেখ করাতে গেলে প্রথমেই মনে হবে তাঁর বিভিন্ন নাটকের নাম; কিছু চিন্তা করলে নাটকে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন এক আধটা সনেটের নামও হয়ত মনে পড়তে পারে কিন্তু রেপ অবলক্রোশি বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা না করলে বোধহয় কারোরই মনে পড়বেনা।

তাছাড়া আরো একটা কথা আছে এমনি পড়তে গেলে, যে সংলাপ চিত্তাকর্ষক মনে হয়না, অভিনয়ের গুণে তাকে অপূর্ব বোধহতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দিই, বাঙলা রঙ্গমঞ্চে গিরিশ-যুগের ঐতিহ্যের শেষ ধারক ও বাহক শিশিরযুগের অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের নাট্যাচার্য সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বা দানীবাবুর কাছে এক তরুণ তাঁর প্রথম লেখা নাটক নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন। দানীবাবু প্রথমে তাঁর নাটক অভিনয় করতে খুব ইচ্ছুক ছিলেন না (অবশ্য নাটকের দোষগুণ বিচার করে নয়, নাট্যশালার আর্থিক দুরবস্থা বিচার করে।) কিন্তু নাট্যকারের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত নাটকটি অভিনয় করতে সম্মত হন।

অভিনয়ের দিন নাট্যকার অধীর আগ্রহে অভিনয় দেখতে এলেন, কিন্তু দানীবাবুর মুখের সংলাপ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হল। নিজের মনে বিচার করে তিনি স্থির নিশ্চয় হলেন, এ অপ্রিয়াবী সংলাপ তাঁর লেখা নয় দানীবাবু নাটকীয় প্রয়োজনে পরিবর্তন করেছেন নিশ্চয়ই। অভিনয়ের অবকাশে কথাটা দানীবাবুকে বলেই বসলেন তিনি, শুনে দানীবাবু রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে নাকি বলেছিলেন—আমাকে এতবড় অপমান কেউ কখনো করেনি। আমি কি লেখাপড়া জানি যে, লেখা বদলাবো।

আমাদের আলোচনায় দানীবাবুর উত্তর বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু নটের নৈপুণ্যে নাট্যকারের নিজের সৃষ্টিও অন্যের বলে মনে হওয়া মোটেই আকস্মিক নয়। কখনো কখনো চরিত্রের যে রূপ নাট্যকারের কল্পনাতেও ছিল না, নটের অভিনয় নৈপুণ্যে সেই রূপ প্রকাশিত হয়ে নাটককে অধিকতর সুষমামণ্ডিত করেছে। অবশ্য বিপরীত ঘটনাও সে কখনো ঘটেনি বা ঘটেনা এমন নয়, তবে তা সম্পূর্ণভাবেই অভিনেতার অক্ষমতার পরিচায়ক। নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ি আমাদের কাছে বলেছেন, প্রথম প্রথম যখন আলমগীর অভিনয় করতুম তখন রোজ রোজ চরিত্রের নতুন নতুন দিক দেখতে পেতুম।

এই একই চরিত্রের নিত্য নবরূপায়ণই নাটককে অপরূপ শোভাময় করে তোলে। বিদগ্ধ দর্শকও বার বার অভিনয় দেখেও ক্লান্ত হননা। অতি পুরাতন তত্ত্বের নব আবিষ্কার যদিনা ঘটতো তা একই নাটকে নট দিনের পর দিন অভিনয় করতে পারতেন না। আবার একই ভূমিকায় দুই বিভিন্ন নটের রূপারোপে নটের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিভিন্ন হয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকারের চেয়ে নট শক্তিমান। এর প্রমাণও খুঁজতে হবেনা। সেক্সপীয়রের নাটকের নায়করা তৎকালীন প্রথাগত অভিনেতা বার্বেজের বয়সের সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলেছে। ইবসেন ছিলেন স্টেজ ম্যানেজার, স্টেজের সুবিধে অসুবিধে হিসেব করেই তাঁর নাটক লেখা; আবার তাঁর নাটকের চরিত্রগুলো অধিকাংশই তাঁর স্টেজের বাঁধা আর্টিস্টদের উপযোগী করে লেখা। আমাদের দেশেও গিরিশচন্দ্র নাটক লিখেছেন তাঁর দলের লোকেদের কথা ভেবে। তাঁর সিরাজোদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, শঙ্করাচার্য ইত্যাদি নাটকের মূলচরিত্র রচনা করেছিলেন দানীবাবুর অতুলনীয় কণ্ঠস্বর আর দমের কথা স্মরণ রেখে। এই নাটকের সংলাপ যে ভাবে উচ্ছ্বসে নেবেছে তা একমাত্র দানীবাবু বা তাঁর অনুরূপ

কোন নটের পক্ষেই অনুসরণ করা সম্ভব ছিল। অন্যান্য বাঙলা নাটকের মধ্যেও দেখা যায় এক একটি নাটক এক এক বিশেষ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কথা স্মরণ করেই রচিত। রীতিমত নাটকের দিগম্বর বা জীবনরঙ্গের অমরেশ নাট্যাচার্য শিশির কুমারের জন্যই গড়া ভূমিকা, আবার পি, ডব্লু, ডি-র মিঃ সেন সম্পূর্ণভাবে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই সৃষ্টি। আবার আবার কোন কোন চরিত্রের সঙ্গে কোন কোন অভিনেতা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে যে অন্য যে কেউই সে ভূমিকায় অবতরণ করুননা কেন তাঁকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতেই হবে। যেমন, সাজাহানের সঙ্গে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নাম। ঐ একই ভূমিকায় নাট্যাচার্যের অভিনয়ও জনসাধারণের কাছে খুব আদরনীয় হয়নি; অবশ্য বিচারবুদ্ধিশীল দর্শকের কাছে একই ভূমিকায় সম্পূর্ণ অনায়সের আস্বাদন অনুপম বলে বিবেচিত হতে পারে কিন্তু তবু বিশেষ চরিত্র বিশেষ অভিনেতা দ্বারা অভিনীত হওয়াই বোধ হয় শ্রেয় মনে হতে পারে।

এর থেকে আমরা নিশ্চয় এই ধারণা করতে পারি যে, নাটক হ'ল নটের জন্য। নটের অভিনয়কলা নাটকের সম্পূর্ণ রূপটা আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে দিতে পারে এবং যদি অভিনয় না দেখে শুধু নাটক পড়া যায়ত সব সময়ে তার অন্তর্নিহিত গূঢ় রস আস্বাদন করা সম্ভব হয় না। এ সম্বন্ধে একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে শিশিরকুমার বলেছিলেন যে, নাটকের সাহিত্য মূল্য তার অর্থ বোঝবার পক্ষে কষ্টকর একথা বলা যায় না। পরপর অনেক উপমা থাকায় একটা উপমা বুঝতে না বুঝতে আরো অনেকগুলো উপমা এসে পড়ায় বোঝবার অসুবিধা হয়, এই কথা বলায় বলেছিলেন—তবে আর অভিনেতা আছে কি করতে? অভিনয়ের গুণে চোখের সামনে পারা ছড়িয়ে পড়ছে দেখতে পাবে।

তাহলে আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হ'ল তার অভিনীত রূপই প্রধান। কিন্তু এইকথা বললেই ল্যাঠা চোকে না, দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে—নট নাটক আর নাট্যকারের মধ্যে কে প্রধান? এ প্রশ্নের আলোচনাও করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে—নটই প্রাধান্য দাবী করতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নাট্যকাররা মানতে রাজী হবেন না, তাঁরা বলবেন—বারে আমরা খেটে মরব আর নেপোয় দই মারবেন।

অবশ্য এই দুনিয়াতে নেপোরা যে চিরকাল দই মেরেছে এবং চিরকালই মারবে এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই, তবে নাটকের ক্ষেত্রে নটরা ঠিক নেপো পদবাচ্য কিনা সে সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ আছে। নট আর নাট্যকারের সম্বন্ধ লাঙ্গলের হল আর ফলার সম্বন্ধের অনুরূপ। ফলাখানা না থাকলে হলখানার দূরবস্থার সীমা থাকবেনা।

আজকের দিনে ছাপাখানার প্রসারের দৌলতে একদল নাট্যকার বলতে সুরু করেছেন যে তাঁদের নাটক শুধুমাত্র পড়বার জন্য, অভিনয়ের জন্য নয়। কথাটা অনেকটা আগুর ফল টকের মত শোনায়। নাটক লেখা হ'ল পড়ার জন্য বলা, আর সোনার পাথর বাটিতে কাঁঠালের আমসত্ত্ব খাওয়া একই কথা, আমরা প্রথমেই দেখেছি, নাটকের আর এক নাম দৃশ্যকাব্য। যে দেখাই গেল না তা নাটক হয় কি করে? অবশ্য বিদেশী ভাষায় লেখা নাটকের অভিনয় দেখা কঠিন, তাই সে সব নাটক পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই কিন্তু একখানি সেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনয় দেখা সমস্ত সেক্সপীয়ার গ্রন্থাবলী পড়ার চেয়ে তাঁর নাটক বোঝার পক্ষে সাহায্য করে অনেক বেশী।

সুতরাং নাট্যকার স্বয়ম্ভু বলে যে একটা কথা উঠেছে তা স্বীকার করা সম্ভব নয়। তা যদি হ'ত, বার্ণার্ড শ-র মত মানুষ তাঁর নাটকের অপ্রচ্ছেদ করতেই দিতেন না। শ'র 'ম্যান এণ্ড সুপারম্যান'এর বিখ্যাত অংশ 'ডন জুয়ান ইন হেল' অভিনয় কালে সর্বদাই পরিত্যক্ত হয়েছে (ইদানীং কালে প্লেরিডিং এর সময় ঐ অংশটি আলাদাভাবে পড়া হয়।) 'পিগম্যালিয়নে' শ যে-

ভাবে শেষ করেছেন তা কোনদিনই অনুসৃত হয়নি বরং হিগিন্সের সঙ্গে এলিজা ডুলিটলের মিলনেই নাটকের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। সেক্সপীয়ারের নাটকেও প্রাচীন কালের বিখ্যাত অভিনেতা-পরিচালকরা পছন্দসই ভাবে কাটাকুটি করতেন। আরাভিং এর করা সেক্সপীয়ারের এডিশনের সঙ্গে ভেরিটির এডিশন মিলিয়ে দেখলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমাদের দেশেও এ প্রথার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণে বিশ্বরূপ দর্শনের দৃশ্যটা শিশিরকুমার বাদ দিতেন ঃ এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নাটকের অঙ্গচ্ছেদ করতেও তিনি দ্বিধা করতে নি এবং তাঁর যুক্তি মেনে রবীন্দ্রনাথও পরিবর্তন করতে কুণ্ঠিত হননি। অন্ততঃ একটি নাটকে শিশিরকুমারের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাটকের নাম পর্যন্ত পালটেছেন তিনি। শোনা যায়, গোড়ায় গলদ নাটক সম্বন্ধে শিশিরকুমার বলেছিলেন—আপনি গোড়ায় গলদ করে আমাকে শেষরক্ষা করতে ডাকলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমার নির্দেশিত পরিবর্তন ঘটিয়ে গোড়ায় গলদের নবনামকরণ করেন শেষরক্ষা। অবশ্য নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে পরিবর্তিত নামটি খাপও খেয়েছে চমৎকার।)

এতকথার পর, মোদ্দা কথাটা কিন্তু এই দাঁড়াচ্ছেনা যে, নাটক বা নাট্যকার কিছুরই প্রয়োজন নেই, নট যদি বর্ণ পরিচয় পড়েন তাও সুখপাঠ্য হবে। বরং এই কথাই বলা চলে যে, নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে নট স্বয়ম্ভু এই কথাটা স্বীকার করে নিলেও, নাটক বা নাট্যকারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বরং নাটকীয় দ্বন্দ্বের কথা মনে রেখে নাট্যকার যদি সুসমঞ্জস ও ঘটনার সাহায্যে উপযুক্ত নাটক রচনা করতে পারেন এবং তা নট কর্তৃক সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয় তে সে নাটক কালজয়ী হবেই। শুধু নট বা শুধু নাট্যকার নাটকের চিরন্তন মূল্য নির্ধারণ করাতে পারেন না। ব্যঞ্জনে যেমন প্রয়োজন যথোপযুক্ত বস্তুর সমাবেশ, সুরন্ধন, সুগন্ধই নয় সর্বোপরি ভোজনবিলাসী সুভোক্তা, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি, নাটক, নট, নাট্যকার, অন্যান্য আনুষঙ্গিক অলঙ্কার ছাড়াও প্রয়োজন সুদর্শকের। আজকের দিনে আর সব কিছুর চেয়ে শেষেরটির অভাবই যেন বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে। যতদিন না উপযুক্ত দর্শক সৃষ্টি হচ্ছে ততদিন নট, নাটক তথা নাট্যকারকে ছাপিয়ে উঠবে অনাবশ্যক অলঙ্কারের জঞ্জাল আর দর্শকরা দুহাত দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করবে। বাঙলার বিদগ্ধ সমাজ কলাক্ষেত্রে যদি বিশেষরূপে দগ্ধ না হয়ে থাকেন তে নেপোদের দই মারা বন্ধ করা সম্ভব, অন্যথায় ভবিষ্যত শুধু অন্ধকারই নয় ভয়াবহ!

রবি মিত্র

সংস্কৃতি ও স্বনারি

সম্প্রতি আমরা সকলেই সংস্কৃতির প্রতি অল্প বিস্তর শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছি; শুধু তাই নয়, জাতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতনাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেই এই মনোভাব জন্ম নিয়েছে বলা চলে। কারণ গুরুত্বপূর্ণ 'পরাধীনতা' নামক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতিই আমাদের সমস্ত মনোযোগ সন্নিবিষ্ট ছিল। দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি চিন্তনীয় বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাববার অবকাশত আমরা তখন পাইনি। আনন্দের কথা, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সেই বিশেষ কারণটি অপসৃত হয়েছে; এবং ঐতিহ্যে মনঃসংযোগ করবার মত প্রচুর সুযোগ ও অবকাশও আমরা পেয়েছি। তাছাড়া জাতীয় সংস্কৃতির চেতনা ও প্রত্যয়টিকে উদ্বুদ্ধ কোরতে

হলে যে ধরণের পরিবেশের প্রয়োজন হয় বর্তমানে তারও অপ্রতুলতা নেই। সর্বোপরি স্বাদেশিকতাকে ও জাতীয়তা বোধকে জাগ্রত কোরতে হলে দেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গুলির পুনর্বিবেচনা করাও যে একান্ত দরকার, এ বোধও ধীরে ধীরে আমাদের হচ্ছে। আজকাল সমাজে, সভায় সংঘে কিম্বা ব্যক্তিগত মজলিশে কেবলমাত্র তাই বিচক্ষণ, রুচিবান বা সুরসিক হলেই চলে না সংস্কৃতিবানের পদটিও সেখানে বহু আকাঙ্খিত। অর্থাৎ আজ থেকে বিশ তিরিশ বৎসর পূর্বে যাঁরা বিদ্যাভিমানী রূপে পরিচিত ছিলেন বর্তমানে তাঁদের অধিকাংশই পরিচিত হয়েছেন সংস্কৃতিবান (যার ইংরেজী প্রতিশব্দ বোধহয় কালচারড্) রূপে। এবং এই জাতীয় অভিমানীর সংখ্যাও বর্তমানে বেড়ে চলেছে। তথাপি এই সংস্কৃতি বস্তুটি যে যথার্থ কি গোত্রের সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা এখনও আমাদের হয়নি। যে সমস্ত গ্রন্থজীবী গবেষক এর স্বরূপ অনুসন্ধানে নিরত তাঁদের অধিকাংশই উপনীত হয়েছেন ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে। আবার যাঁরা মাটি ও মানুষের সনাতন সংযোগকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয়েছেন তাঁরাও যে অভ্রান্ত একথাও বলা চলে না। এই নিয়ে স্পষ্টতই দুটি মতামত দেখা যায়। একদল সংস্কৃতিকে এলিয়ট, ম্যানহাইম ইত্যাদির অনুসরণে একটি প্রায় নিরালম্ব ভাবাশ্রয়ী ঐতিহ্যের সঙ্গে তালিকা ভুক্ত করেছেন; অপর দল জনচিত্তে আশু ফলপ্রদ কয়েকটি প্রমোদোপকরণকেই নাম দিয়েছেন সংস্কৃতি রূপে। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে আছেন স্বাতন্ত্র্যকামী দেশের ইনটেলেজেন্সিয়া গোষ্ঠী, আর শেষের দলে অপর-চালিত, শিক্ষিত জনতার একটি বৃহৎ অংশ। এই উভয় আদর্শের সংঘাতে আমাদের দেশে একটি বিচিত্র পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমত, যাঁরা সাধারণ শিক্ষা-দীক্ষায় এবং জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত তাঁরা বিভ্রান্ত হয়েছেন সবচেয়ে বেশী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই তাই প্রায় এলার্জিক হয়ে উঠেছেন বিচিত্রকুলোদ্ভব এই সংস্কৃতি বস্তুটির প্রতি। ছদ্ম-পণ্ডিতেরা বা আরও প্রকট অর্থে পাণ্ডিত্যাভিমানীরাও এই ভীতি ও অমনোযোগের সুযোগে আমাদের এক্সপ্লয়েট কোরতে শুরু করেছেন। নানা উদ্ভট বিষয়কে সংস্কৃতি রূপে চিহ্নিত করে, কখনো সংস্কৃতিকে নানা মনগড়া পরিসংখ্যানের আশ্রয়ে বিকৃত করে তাই বর্তমানে পরিবেশন শুরু হয়েছে। নানা অর্বাচীন, বিদেশী ও তুচ্ছ বিষয়কেও সংস্কৃতির পরিচয় পত্র দেখিয়ে হঠাৎ প্রাচীন ঐতিহ্য বলে চালানোর একটি প্রবণতাও ব্যাপক হয়ে উঠেছে প্রায় সর্বত্র। এছাড়া কৌলিক পরিচয়বাহী যে কোন প্রাচীন বস্তুকেই আমরা অন্ধভাবে পূজা কোরতে সুরু করেছি। এই দুর্বলতার সুযোগে জনতার প্রত্যয়কে প্রতারণা করে একদল লোক অসদুপায়েরও সুযোগ নিচ্ছে। কেউ কেউ সংস্কৃতি-পৃষ্ঠপোষকতার নামে স্বার্থ সিদ্ধিতেও অবতীর্ণ। আমাদের অনেকের মনে, পূর্বেই বলেছি, একটি বদ্ধমূল সংস্কার আছে যে, যা কিছু প্রাচীন তাই বুঝি গৌরবের গুরুত্বের এবং ঐতিহ্যের অংশভাক। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর ডেকাডেণ্ট সাহিত্য অশ্লীল কবিগান প্রভৃতিকেও সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন বলে আমরা সম্প্রতি অশোভন ভঙ্গিতে গদগদ হচ্ছি। এই ভাবটি অবশ্য স্বভাবস্ফূর্ত্ত নয়— অপর কর্তৃক প্ররোচিত। উনবিংশ শতাব্দীর রেণেসাঁসের কালে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য আদর্শ ও আচরণ প্রীতি যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল ঠিক সেই সময়েই এই ধারার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সৃষ্টি হয়েছিল এক অন্ধ-স্বাজাত্য বোধের ও ঐতিহ্য মোহের। সেকালের বাঙলা দেশে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ ও চেতনার বিপুল প্রতিবন্দ্বিতায় এই বিপরীত প্রত্যয়টি বিশেষ প্রবল আকার ধারণ কোরতে পারেনি; কিন্তু বর্তমানে সে প্রতিস্পর্ধা অপসৃত হওয়ায় এবং নবোদ্যমে জাতীয়তার জোয়ার আসায় প্রাচীন মোহটি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বসেছে। বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুরের প্রতি আমাদের এই সাম্প্রতিক পক্ষপাতকে কেউ কেউ তাই যথারীতি 'এক্সপ্লয়েট' কোরতেও শুরু করেছেন। সংস্কৃতি-মনাতা আবার বর্তমানে যে

একটি বহু প্রচলিত ইনটেলেকচুয়াল পোজ, এর উদাহরণও বহু জায়গাতেই পাওয়া যাবে। নানা সম্মেলনে, সভায় কিম্বা আলোচনা-চক্রে অহরহ আমরা সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে পরস্পর বিপরীত মতামত শুনে থাকি তার মধ্যেই এই ভাণের স্বরূপ সুপ্রকট। এবং স্বয়ং যা বুঝি না বা বিশ্বাস করিনা অনেক সময় অজ্ঞতা প্রকাশ হবার ভয়ে কিম্বা আত্মপ্রবঞ্চনার নিগূঢ় তাগিদে সমাজে সর্ব সমক্ষে তাই প্রচার করে থাকি। সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা উন্মাসিকচেতনাই প্রধানত এর জন্যে দায়ী। এর সঙ্গে সঙ্গে একটি সম্মোহনী মনোভাবও সংক্রামক হয়ে পড়েছে। ফলে যে বিষয়কে স্বাভাবিক বিচারে তৃতীয় শ্রেণীর বলে মানি এবং নকল বলে অশ্রদ্ধা করি লোক সমক্ষে তাকেই সংস্কৃতির ধারক বলে মিথ্যা-গর্বে পরিচিত কোরতে আমাদের একটুও বাধে না। বিস্মৃতির পঙ্ক কুণ্ড থেকে এই জাতীয় নানা বস্তুকে কোন ক্রমে উদ্ধার করে এনে জাতীয়-ঐতিহ্য বলে প্রদর্শন করার মধ্যেই এই ধরণের মনোভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে। অথচ যা সত্যিকারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ও সৌন্দর্য-বোধের নিদর্শন তা প্রায়শই অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে বর্ণশঙ্কর সংস্কৃতি গঠনের নানা প্রয়াশের কথাও উল্লেখ্য। এক জাতীয় প্রতারক আছেন যাঁরা প্রাচীন ও আধুনিকের রাসায়নিক সংমিশ্রণে এই 'অভিনব' বস্তুটির জন্ম দিয়েছেন। আসল কথা, একটি স্নবারির মনোভাব থেকেই উদ্ভব হয়েছে এই সমস্ত বিকৃতির। এরিস্টোক্রেটিক অথচ বুদ্ধিজীবী সমাজে সংস্কৃতি নিয়ে এই ধরনের স্নবারি অতন্ত প্রকট। নানা 'মেক-বিলিফে' কন্টাকত তাঁদের চিন্তায় এই অস্বাভাবিকতা অতি ধীরেই সংক্রামিত হয়েছে। অবশ্য পরিবেশের অনুকূলতাও যে সাহায্যকারী হয়নি তা নয়। সকল কিছু মিলিয়ে তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই হয়ে পড়েছেন এক একটি 'আর্ট-স্নব'। মনস্বী লেখক এলডুয়াস হাক্সলী তাঁর 'সিলেকটেড স্নবারীজ' প্রবন্ধে বলেছেন— Most of us are... art snobs. There are two varieties of art snobbery—the platonic and unplatonic. Platonic art-snobs merely take an interest in art. Unplatonic art snobs go. further and actually buy art Platonic art snobbery is a branch of : culture-snobbery. Unplatonic art snobbery is a hybrid or mule; for it is simultaneonsly a sub species of culture-snobbery and of proffesional snobbery. A collection of works of art is a collection of culture symbols, and culture symbols still carry social prestige;it is also a collection of wealth symbols. (Music at Night Page-147)

শুধু তাই নয়, তিনি অন্যত্র বলেছেন যে এই জাতীয় দুষ্প্রাপ্য 'কালচার-সিম্বল' সংগ্রহের মাধ্যমে আমরা অনেক সময় অবচেতনভাবে ধন গর্বও প্রকাশ করে থাকি। বাড়ী, গাড়ী বা আর্থিক কৌলীন্য যেমন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের অন্যতম উপায় সংস্কৃতিপুষ্ট পোষকতাও সম্প্রতি তেমনি তার অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তাই যখন কিউরিও-এর দোকান থেকে বকুড়ার পুতুল কিনি কিম্বা সংস্কৃতি সম্মেলনে দীর্ঘ সময় ধরে অশ্রাব্য কবিগান শুনি তখন নেপথ্যে আমাদের স্নবারিটিই আরো প্রকট হয়ে ওঠে।।

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

স মা জ স ম স্যা

দুর্নীতি : সমাজ ও সরকারী দপ্তর

পরলোকের দিকে দু'চোখ রেখে যে দেশের সমাজ-বিধান নির্দিষ্ট হয়েছে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, সেই দেশেই দুর্নীতি সমাজব্যবস্থার অন্যতম নীতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বহু যুগের ঐতিহ্য, সংস্কার, ধর্মশিক্ষা এবং আদর্শের প্রেরণা হার মেনেছে প্রভাব প্রতিপত্তির কাছে, সুবিধা লাভের সামান্য মোহের কাছে। একদিকে রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৈতিক পথ-প্রদর্শক এবং সমাজের কর্ণধারগণ দুর্নীতিকে গ্রহণ করেছেন বা তার প্রশ্রয় দিচ্ছেন কর্মকৌশলের নামে। অন্যদিকে সমাজের সাধারণ মানুষ—মূলতঃ যারা সৎ—প্রতিকূল অবস্থার চাপে, অব্যবস্থিত বর্তমানে দিশে হারা হয়ে সুনীতিকে বিসর্জন দিচ্ছেন স্থিতির আশায়। অথচ এই অনিশ্চয়তা, হতাশা ও নিদারুণ শঙ্কায় মানুষকে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারে এমন জীবন-দর্শনও কেউ তুলে ধরতে পারছেন না। তিনের একমুখী যাত্রায় তাই সমাজে বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও অনৈতিকতা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে মহামড়কের মত। সভাবতঃই প্রশ্ন জাগে কেন এমন হল?

পাপপুণ্যের কঠিন কাঁটাতারে যে সমাজে ব্যক্তিজীবন ছিল রুদ্ধ, সেখানে কোনক্রমে পাপ-ভীতি, ধর্মভীতিতে একবার চিড় খেলে তা রক্ষা করা কঠিন। শুধু কঠিন নয়, সেই সুড়ঙ্গ পথে অধোগতির কী যে তীব্র ধারা বয়ে থাকে কার সাধ্য রোধে তার গতি? সমাজ-দেহের মধ্যে বহুকাল থেকেই ধীরে ধীরে এই বিপরীত শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। সামন্ত তথা জমিদারী ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়ে এসেছে, আর সেই সঙ্গে সুরু হয়েছে শিল্পায়নের। এবং তার উপরে এসে পড়েছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ, তার চেয়েও বড় কথা, বিকৃত অনির্দেশ্যবাদ। কিন্তু ভারতীয় সমাজের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। সাঁড়াসী আক্রমণ বা পরমাণু বোমার বিস্ফোরণে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইনি বটে, কিন্তু আমাদের মূল্য দিতে হয়েছে আরও অনেক বেশী। আমার মতে, মহাযুদ্ধের সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে—সবচেয়ে ভয়াবহও বটে—আমাদের জাতির নৈতিক চরিত্র। যুদ্ধের বাজারে একদল চরম দুর্নীতির পরিচয় দিয়ে ধনশালী হয়ে উঠেছে। তাদের হাতেই গিয়ে পড়েছে সমাজের অধিনায়কত্ব। আর একদল সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসেছে; অগণিত লোক ক্ষুধার জ্বালায় পথেঘাটে ধুকে ধুকে মরেছে—আইন, নীতি বা সমাজের গায়ে এতটুকু আচড়ের দাগ না রেখে।

শুধু তাই নয়। আমাদের লজ্জা, ঘৃণা, অনুভূতি ও সহমর্মিতা নিঃশেষ হয়ে না গেলেও অনেক ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। মহাযুদ্ধের সময় একাংশের নৈতিক অধঃপতন সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠালাভ, এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরে শত শত লোকের অসহায় কীটের মত মৃত্যু আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তারপরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় আত্মরক্ষার জৈব-প্রেরণায় মনুষ্যত্বের শেষ চিহ্নটুকুও বিসর্জন দিতে হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরেও সাধারণ লোকের,- বিশেষতঃ উদ্বাস্তুদের অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশা ক্রমাগত দেখে দেখে আমরা ধরে নিয়েছি যে ওটাও একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। বোধ করি সেই কারণেই আজ অন্যের বিপদে, অন্যের কষ্টে মন তেমন করে সাড়া দিয়ে ওঠে না। নির্বিকারত্বের সাধনায় আমরা যেন সিদ্ধি লাভ করতে চলেছি।

দ্রুত শিল্পায়ন এবং সেই সঙ্গে নাগরিক জীবনের ভারসাম্যহীন প্রসার নৈতিক অবনতির

প্রথম সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় সম্পদের অসম বন্টন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে কর্মসংস্থানের বেকার সমস্যা দিনের পর দিন তীব্র হয়ে উঠছে। অথচ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় বিপুল অর্থ বিনিয়োগের ফলে সহর, নগর এমনকি সুদূর পল্লীরও দ্রুত রূপান্তর ঘটছে। উন্নত জীবনের আস্বাদ লাভ করে আমাদের অভাব বোধ বেড়ে গিয়েছে অনেক। কিন্তু সেই অনুপাতে প্রকৃত আয় বাড়েনি। এই অভাব পূরণে সহরাঞ্চলের দিকে মানুষের ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কৃষি ভিত্তিক একান্নবর্তী পরিবার তাই ভেঙ্গে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে একান্নবর্তী পরিবারের শৃঙ্খলতাবোধ, ঐক্যবোধ, পারস্পারিক সহানুভূতি। সুবিস্তৃত পল্লীর আবাস ছেড়ে মানুষ যেমন সহরাঞ্চলের দুই কি এক কামরায় ফ্লাটে জীবন-ধারা সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে তেমনি সীমিত হয়ে আসছে তার মনের প্রসারতা, সংকীর্ণ হচ্ছে চিন্তাধারা। তাই স্বভাবতঃই আমরা অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছি। পারিবারিক সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসছে, এমন কি বন্ধুত্বের মধুর অন্তরঙ্গতা বিস্বাদে রূপান্তরিত হচ্ছে। আজও পল্লী অঞ্চলে যে প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব আছে সহর, উপনগরীতে তা প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। এর সামগ্রিক ফলে এই হচ্ছে যে, বিপুল জনাকীর্ণ নগরীতে মানুষ কীটের মত জড়াজড়ি করে বাস করলেও অন্তরের দিক থেকে সে ক্রমেই দারুণ নিঃসহায়, নিঃসঙ্গ বোধ করছে।

এই অসহায় অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা। কি দক্ষিণপন্থী, কি বাম পন্থী তাঁদের সকলেরই আজ একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতা আয়ত্ত করা। লক্ষ্যই একমাত্র সত্য, পন্থা গৌণ, ব্যক্তি লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একটা হাতিয়ার মাত্র। যে কাজ সাধারণ মানুষের কাছে এখনও অচিন্তনীয়, এঁদের কাছে তা সাধারণ একটা কর্মকৌশল।

অথচ আশ্চর্য এই, প্রায় সমগ্র সমাজ এঁদেরই স্তাবক। এঁরাই আজ সমাজ-সেবী তথা সমাজপতি। ইংরাজের আমলেই দুর্নীতির সহজ পথে সুবিধা লাভের শিক্ষা আমরা লাভ করেছি। অর্থকেই পরমার্থ হিসাবে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। পরিবারে সেই ছেলেরই বেশী সমাদর যার নিয়মিত বেতনের ওপরেও আছে উপরি আয়। যে ব্যবসায়ী দানধ্যান বেশী করেন তারই নামডাক। কিন্তু কোন পথে সেই টাকা আসছে তা আমাদের বিবেচনার বাইরে। যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করে ঠাকুর দেবতার সেবায় কিছুটা অর্পণ করলে, বা তীর্থপুণ্য করলে পাপ গায়ে লাগবে না এ-বিশ্বাসও প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। শিল্পী, সাহিত্যিক—যাঁরা নৈতিক আদর্শের ধারক ও প্রচারক—ব্যক্তি জীবনে তাঁরাও সুবিধা লাভের জন্য ক্ষমতাবানদের দারস্থ হচ্ছেন। এমন কি আদর্শান্তরণেও তাঁদের ইতস্ততঃ নেই। ফলে তাঁদের মধ্যেও দলাদলি ছড়িয়ে পড়েছে। প্রভাব প্রতিপত্তির টানাপোড়েনে সংবাদপত্রও আজ ক্রীড়নকে পরিণত। অর্থাৎ এক-কথায় বলা যায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরাই দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা।

আরও একটা দিক আছে। স্বাধীনতা লাভের পরে শিল্প ব্যবসায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশী লোক এসে জুটেছে এই ক্ষেত্রে। রাতারাতি বড়লোক হবার বাসনা সকলের। কিন্তু ন্যায়ের পথে তা কখনই সম্ভব নয়। এই তীব্র অথচ অসম প্রতিযোগিতায়, বিশেষতঃ সরকার আরোপিত বিচিত্র বাধানিষেধের মুখে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সর্বস্তরের লোকের মাধ্যমে অন্যায়, অসমীচীন, নৃশংস পন্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে। কর ফাঁকি দিতে হিসাবেরও কারচুপি চলেছে, কর্মীদের বঞ্চিত করতে অসংখ্য ফন্দিফিকির আটতে হচ্ছে, আর অন্যায় সরকারী সুবিধালাভের জন্য সরকারীকর্মচারীদের অর্থ ও সুবিধার প্রলোভন দেখাতে হচ্ছে।

আজ সরকারী দপ্তরে ব্যাপক দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছে তারও বিচার করতে হবে

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। সরকারী দপ্তরের যাঁরা কর্মী—মন্ত্রী, সচিব থেকে চাপরাশী পর্যন্ত —তাঁরা সকলেই আমাদের সমাজের লোক। সেই হিসাবে সরকারী দপ্তরও সমাজেরই একটা অঙ্গ। দুর্নীতি-পোষক সমাজের প্রতিফলন দেখা যায় দপ্তরে। কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, সমাজ ও দপ্তর দুর্নীতির পাপচক্রে পরস্পরের পৃষ্ঠপোষক।

সমাজের অন্যতম ব্যক্তি হিসাবে সরকারী কর্মী আর দশজনের মত একই পরিবেশে মানুষ হয়েছে। তার মনোবৃত্তিও অন্য সকলের মতই। তাকেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি তথা সর্বাঙ্গীণ ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে মানিয়ে চলতে হচ্ছে, যদিও বেতন সেই অনুপাতে বাড়েনি—আর তা সম্ভবও নয়। এই অভাবের মুখে বাইরের সামান্য প্রলোভনেই যে সে দুর্নীতির ফাঁদে পা দেবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এবং এইভাবে অর্থের স্বাদ একবার লাভ করলে তার নিবৃত্তি অসম্ভব।

তা ছাড়া, স্বাধীনতা লাভের পরে যেখানে দেশ আমলাতান্ত্রিকতার হাত থেকে মুক্তি লাভ করবে বলে আশা করেছিল সেখানে আমলাতন্ত্র আরও ব্যাপক, আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। উর্ধ্বতন কর্তার খেয়াল চরিতার্থ করেই চলতে হবে, নইলে চাকরী রাখা অসম্ভব। কেননা, কর্মী যতই সৎ, যোগ্য ও উদ্যোগী হোক না কেন কর্তার গোপন রিপোর্টের উপরেই তার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। আবার, অন্যদিকে, সরকারী দপ্তরের কানুন ক্রমেই সুদৃঢ় হয়ে উঠার ফলে অযোগ্য কর্মীকে সরাসরি বিদায় করাও প্রায় অসম্ভব। এই দুশ্চক্রে সৎকর্মীর পক্ষে বিবেক বাঁচিয়ে কাজ করা এক সুকঠিন সমস্যা।

স্বাধীনচেতা কর্মীকে হয় অবনতি স্বীকার করতে হচ্ছে, নয় সরে যেতে হচ্ছে। এই ভাবে সরকারী কর্মীদের মনোবল তাঁরা একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছেন। সকলেই বুঝে নিয়েছে কাজ দেখিয়ে লাভ নেই, লাভ কর্তার মনস্তুষ্টিতে, সর্বোর্ধ কর্তার পদলেহনে। তাই কাজ যত না বাড়ছে, তত বড় হচ্ছে দপ্তর, কর্তাদের 'নিজেদের লোকে'র ভিড় তত বাড়ছে। তার ফলে অবস্থা আরও সংকটাকার ধারণ করছে।

এই সংকটের ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে ষ্ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। তবে ষ্ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে শ্রমিক ও কর্মীদের কোন লাভ হয়নি এ-কথা বলা অন্যায় হবে। কিন্তু এদেশে ষ্ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনেরই অঙ্গ এবং শ্রমিক নেতারা মূলতঃ রাজনৈতিক নেতা। শ্রমিকদের দাবী আদায়ে তাঁরা উদ্যোগী, আর তাতে তাঁরা সাফল্যও লাভ করেছেন। কারণ, শ্রমিকদের লাভের একটা অংশ তাঁদের দলেই আসবে। এতেও আপত্তি কিছু নেই। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, শ্রমিকদের অধিকতর যোগ্যতা অর্জনে, আরও বেশী কাজ করবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে তাঁদের তেমন উৎসাহই দেখা যায় না। ফলে সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে যে মনোভাব প্রবল হ'য়ে উঠেছে এক কথায় তাকে বলা যায়—'কাজ করবো না, কিন্তু বেশী মাইনে দিতে হবে।' উক্তিটি শ্রুতিকটু, হয়ত অশোভনও, কিন্তু নির্মম সত্য।

বর্তমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অনিবার্য ফসল দুর্নীতি। কাজেই দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে আগাগোড়া ঢেলে সাজাতে হবে। শুধু আইন করে বা স্বস্তিবচন পাঠ করে কোন লাভ হতে পারে না।

অভী দাস

স মা লো চ না

আধুনিক কবিতার ভূমিকা। সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সবিতা প্রকাশ ভবন। মূল্য ৩·৫০ নঃ পঃ।

ইতিপূর্বে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের "তিনজন আধুনিক কবি" সমালোচনা গ্রন্থটি পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদর অর্জন করেছিল। আলোচ্য গ্রন্থটি তারই একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ। এতে একদিকে যেমন কয়েকটি নতুন পরিচ্ছদ অন্তর্গত হয়েছে অন্যদিকে জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসুর ওপর লেখা মূল প্রবন্ধ তিনটি অল্পবিস্তর পরিমার্জিত হয়েছে। নতুন নামাকরণে গ্রন্থটির প্রয়োজন-ব্যাপকতা বেড়েছে সন্দেহনেই, কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে "আধুনিক কবিতা" বলতে যে ব্যাপক পরিসর বোঝায় তা পাঠক চিত্তে সঞ্চারিত করে দিতে বইটির ভূমিকা পুরোপুরি সার্থক হয়েছে কিনা। যোগ্য নামাকরণের গুরুত্ব আজ এত অধিক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কারণে যে, কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানিত একটি এই ধরণের গবেষণামূলক গ্রন্থ পাঠককে তার নামাকরণের ত্রুটি দ্বারা আমাদের প্রতারিত করেছিল। আধুনিক বাংলা কবিতার একটি সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরবার সেই পরিশ্রমী প্রচেষ্টা আন্তরিক শ্রদ্ধা উদ্রেক করলেও রচয়িতা এমন একজন কবিকে তার আলোচনার বাইরে রেখেছিলেন, যাকে বাদ দিয়ে আধুনিক কবিতার কোন আলোচনা কি করে সম্ভব, আমরা আজ পর্যন্ত তা বুঝতে অক্ষম। বলা বাহুল্য সেই অনালোচিত কবি ছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র। সঞ্জয়বাবুর গ্রন্থটি সে ধরণের কোনো ভুল ধারণার সৃষ্টি না করলেও সামগ্রিকতা সম্পর্কিত প্রশ্নটি কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

সঞ্জয়বাবু তার আলোচনাকে মোটামুটি আটটি পরিচ্ছদে ভাগ করে নিয়েছেন। ১। কবিতার বিচার ২। রবীন্দ্রোত্তর কবিতা ৩। জীবনানন্দ দাশ ৪। প্রেমেন্দ্র মিত্র ৫। বুদ্ধদেব বসু ৬। কল্লোল শাখা ৭। তৃতীয় ও চতুর্থ দশক ৮। পঞ্চম দশকের কাব্যোদ্যম। অবশ্য এই আটটি পরিচ্ছদে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে থেকে উত্তরতিরিশের কবি নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত কবিই আলোচিত হয়েছেন, এবং "ভূমিকা" শব্দটি যে অর্থগত দায়িত্বে গুরুভার নয় সে কথা মনে রাখলে এ কথা বলতে দ্বিধা থাকেনা যে এ জাতীয় সুন্দর আলোচনা ইতিপূর্বে আমরা খুব কমই পড়েছি। সমালোচকের প্রধান কর্তব্য কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে সঞ্জয়বাবু লিখেছেন "কবিতার চরিত্র প্রকাশ করাই সমালোচকের কর্তব্যকর্ম। চরিত্র বলতে প্রথমে বোঝাবে, প্রচলিত সত্য বা মিথ্যা, যাই হোক, ভাবগত বুদ্ধিগ্রাহ্য রস। দ্বিতীয়ত, শ্রুতির ও পাঠের স্বাদ—ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গ এইখানেই আসে এবং তৃতীয় প্রসঙ্গ ধ্বনিতত্ত্বে সমালোচককে প্রবেশ করতে হয়। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক সাধারণত আপন সংস্কারগত ধ্বনি—চিত্রের পশ্চাদ্ধাবন করে ভ্রমে পতিত হন। কবিতার শব্দ-বহির্ভূত কোনো চিত্রে চলে যাওয়া হয়তো আত্মরতি। তেম্নি কবিতায় ব্যঞ্জিত কোন শব্দের সূক্ষ্ম চিত্র বা সুরে উপেক্ষা করাও অনুচিত।"—এই উক্তি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি প্রত্যেক সমালোচক (তা সে যত সৎ এবং যুক্তিনিষ্ঠই হোন না কেন) তার ব্যক্তিবৃত্তি ও ব্যক্তিগত সংস্কার দিয়েই তার পাঠ্যবস্তু বিচার করেন। সুতরাং ধ্বনি-চিত্রের পশ্চাদ্ধাবনরত-ভ্রমের অভি-

যোগ থেকেতো কোনো সমালোচক মুক্তি পেতে পারেন না। বরং এই রুচিবৈচিত্র আছে বলেই বিভিন্ন ধরণের বিচারের আলো চতুর্দিক থেকে আলোচ্য বিষয়টির ওপর এসে পড়ে। তাতেই সেই বিষয় বা শিল্পকর্মটি তার যোগ্য ভারসাম্য খুঁজে পায়।

গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশটি হচ্ছে কবি জীবনানন্দ দাশের ওপরে লেখা পরিচ্ছদটি। জীবনানন্দ দাশের ওপরে এর চেয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এই শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে এবং রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেও কি করে তিনি একদা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল ইসলামের স্বল্পস্থায়ী প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমরা আরো বিস্মিত হই যখন ভাবি উত্তরকালের এই মহান প্রতিভাবান কবির পক্ষে

"সে কোন ছুঁড়ির চুঁড়ি আকাশ—শুঁড়িখানায় বাজে
চিনি মাখা ছায়ায় ঢাকা চুণীর ঠোঁটের মাঝে। (ঝরাপালক)

কি করে এধরণের শিশুপাঠ্য পদ্য লেখা সম্ভব হয়েছিল! শুধু তাই নয়, যে প্রেরণায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একদিন লিখেছিলেন "কাঁটের পাথার অস্ফুটতম বেদনা আমারে হানে", জীবনানন্দ অজ্ঞাতেই তার দ্বারা প্রভাবিত হলেন "কাঁটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আমি সে বেদনা পাই" লিখে। অবশ্য এ বিষয়ে সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে আমরা একমত যে ঝরাপালক কাব্যগ্রন্থ কোনক্রমেই জীবনানন্দের চরিত্রানুগ নয় এবং প্রাথমিক রচনা হিসাবেই কেবল মাত্র স্মরণীয়। পরবর্তীকালে জীবনানন্দের বিস্ময়কর উন্মোচন কালেও বিদেশী কিছু কবি, বিশেষ করে ইয়েটস, তার কবিতায় একাধিবার উপস্থিত হয়েছিলেন। সঞ্জয়বাবু "বনলতা সেন" কবিতাটি আলোচনা প্রসঙ্গে তা নিপুণভাবেই দেখিয়েছেন। কিন্তু "নষ্ট" জগত ছাড়াও যে এক অতীন্দ্রিয়, রহস্যময় ভৌতিক (ভাল অর্থে) জগত জীবনানন্দের ছিল সে বিষয়ে অন্যান্য সমালোচকগণের মত তিনিও যথেষ্ট আলোকপাত করতে পারেননি। ইয়েটস ছাড়া অন্য যে কবি জীবনানন্দকে প্রভাবিত করেছিল বলে আমাদের মনে হয় তার নাম ব্লেক। বস্তুত কবি ব্লেকের ভীতিপ্রদ রহস্যময়তার প্রভাব জীবনানন্দের ওপর যথেষ্ট ছিল। তাঁর অনেক বিখ্যাত কবিতা এই কারণেই আমাদের কাছে আকর্ষণীয়। বাংলা কবিতায় "প্যাঁচা" "ভূত" "ল্যাস" "গাড়ল" প্রভৃতি শব্দকে জীবনানন্দই প্রথম অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছিলেন। ব্লেক নিজে ছবি আঁকতে পারতেন তাই তার তুলি তার কবিতাকে যথেষ্ট ব্যাখ্যাযোগ্য করে রেখে গেছে। জীবনানন্দ কবিতায় ছবি আঁকলেন শব্দ দিয়ে, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ দিয়ে। বাংলা কবিতায় ইন্দ্রিয়জ অধিকারকে এই বহুব্যপকতায় উন্নীত করতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পারেননি। সঞ্জয়বাবু এই শেষোক্ত বৈশিষ্টের লক্ষণগুলিকে তো স্পষ্ট করেছেনই, উপরন্তু জীবনানন্দের অনেক কবিতার উৎসের অভাষও দিয়েছেন। এখানেই তার আলোচনার সার্থকতা।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ওপর লেখা পরিচ্ছদটি সুলিখিত। যদিও প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাবার সময়ে মন্তব্যের গতি কিঞ্চিৎ দ্রুতবেগ। "প্রথমায় যে বাণী তাঁর কণ্ঠে সোচ্চার তা অন্তর্মুখী হয়ে হৃদয়ের অতলে আশ্রয় নিয়েছে, তার লাবণ্যময় স্ফুরণ ক্ষণে ক্ষণে আমরা দেখতে পাই। চারণ কবি অনুভূতিশীল কবি হয়ে উঠেছেন। এ তাঁর সত্যিকারের অপসরণ নয়—সংহত, গাঢ় আবেগে নিবিড় হয়ে ওঠা"—এধরণের মন্তব্য সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ একমত ও শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু অত্যন্ত লজ্জিত হই নিম্নোক্ত উক্তির যথার্থ ব্যাখ্যা না করতে পেরে "কবিমনের ধর্ম প্রেমেন্দ্র মিত্রের চোখ থেকে কঠোর সত্যকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছে। বিংশ-শতকীয় কবিদের দুর্ভাগ্য যে বিজ্ঞানের সঙ্গে সুস্থ প্রতিস্পর্দ্ধিতায় তাঁরা শেলীর মতো রোমান্টিসিজমের পথে কবিতাকে এগিয়ে

নিয়ে যেতে পারেননি"। শেলীর অতিকথনদুষ্ট রোমান্টিকতা কি আধুনিককালের কোন কবির কাম্য? তাছাড়া কবি-মনের ধর্ম যদি প্রেমেন্দ্র মিত্রের চোখকে কঠোর সত্য থেকে আড়াল করে থাকে তাহোলে তিনি তো স্বাভাবিক ভাবেই রোমান্টিক প্রমাণিত হচ্ছেন! আসলে প্রেমেন্দ্র মিত্র "বিবর্তনবাদে" বিশ্বাসী এবং এই বিশ্বাস তার "গ্রাড-নলোয়েজ" থেকেই এসেছে। তার সমগ্র কাব্য ধারণা মানবিক মূল্যবোধের স্বরূপ নির্ধারণের দিকেই ধাবিত।

অপরপক্ষে বুদ্ধদেব বসুই সম্ভবত বাঙ্গলাদেশের প্রথম খাঁটি রোমান্টিক কবি। এ সম্পর্কে সঞ্জয়বাবুর মত—"একথা অতীব সত্য যে বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রেমধর্মে শ্রদ্ধাবান কবি বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আর কেউ আসেননি।" কিন্তু জীবনানন্দের যে পৃথিবী "নষ্ট" হয়েছিল মানুষের মূঢ়তায়, পাপে; বুদ্ধদেব তাকে নারীদেহের সীমিত পুষ্পলতায় নষ্ট করে ফেললেন। তার প্রেম, তার যৌবনবন্দনা তাই ব্যর্থ হলো অতৃপ্তির অরণ্যরোদনে। বইটির পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে তার আলোচনা চিন্তাসমৃদ্ধ হলেও বিতর্কের মুখাপেক্ষী। বিশেষ করে "পঞ্চম দশকের কাব্যোদম" অধ্যায়টি। স্বাভাবিক কারণেই নানা বিতর্কের সূত্রপাত করবে। অধ্যায়টি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতচালের হওয়াতে মনে বিশেষ দাগ কাটেনা। অবশ্য গ্রন্থকার স্বীকার করছেন "সব উল্লেখযোগ্য কবিই যে আলোচনায় স্থান পেয়েছেন তা নয়, এ আলোচনার মূল্য যদি থাকে, তাহলে তা রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার মূল সূত্রগুলি দেখানোর মধ্যেই আছে।"

পরিশেষে এ কথা উল্লেখ না করে পারছিনা, বহুদিন পর কবিতা-আলোচনার ওপর এমন একটি সুন্দর গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে। আমরা আশাকরি প্রত্যেক সংপাঠকই এগ্রন্থটি পাঠ করবেন। পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনীবির্জত এধরণের গভীর ও স্বচ্ছল আলোচনা বাংলাদেশে ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

রমেশ রচনাবলী। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯, মূল্য নয় টাকা।

রমেশচন্দ্র দত্ত—প্রবন্ধ সংকলন। শ্রীনিখিল সেন সম্পাদিত। এভারেস্ট বুক হাউস, কলিকাতা ১১। মূল্য পাঁচ টাকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনীতিজ্ঞ ও সাহিত্য সাধক হিসাবে রমেশচন্দ্র দত্তের নাম চির-স্মরণীয়। রমেশচন্দ্র প্রথম যুগের সদক্ষ সিভিলিয়ান। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিভাগীয় কমিশনার। রমেশচন্দ্রের মনীষা ও কর্মশক্তি দায়িত্বশীল রাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ঋগ্বেদের অনুবাদক, প্রাচীন হিন্দু মনীষার ব্যাখ্যাতা, ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিশ্লেষক জাতীয় কংগ্রেসের নেতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি, সর্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্রের সুযোগ্য উত্তরসাধক ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র জীবনের নানাবিভাগে তাঁহার মনীষা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন, ইংরাজীতে সাহিত্য চর্চায় অভ্যস্ত রমেশচন্দ্র বঙ্কিম চন্দ্রের নিকট বাঙ্গালাসাহিত্য চর্চার প্রেরণা লাভ করিয়া ছয়খানি সার্থক উপন্যাস রচনা করেন, ইহাদের নাম—বঙ্গ বিজেতা (১৮৭৪) মাধবীকঙ্কন (১৮৭৭) মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত (১৮৭৮) রাজপুত

জীবন-সন্ধ্যা (১৮৭৯), সংসার (১৮৮৬), ও সমাজ (১৮৯৪); ইহার মধ্যে প্রথম চারিখানি ঐতিহাসিক ও শেষ দুইটি সামাজিক উপন্যাস। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি গত শতাব্দীতে বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য ছিল। উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় বীরদের বীরত্ব কাহিনী আমাদের জাতীয় আন্দোলনেও শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। সমাজ ও সংসার—এই দুইটি সামাজিক উপন্যাসে পল্লীগ্রামের পারিবারিক জীবনের কাহিনী অপূর্ব সহানুভূতির সহিত চিত্রিত হইয়াছে। রমেশচন্দ্রের অন্য কোন কৃতিত্ব যদি না থাকিত তবুও তিনি শুধু ঔপন্যাসিক হিসাবেই বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্মরণীয় হইয়া থাকিতেন।

বর্তমানে রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সুলভ নহে। আলোচ্য পুস্তকে রমেশচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসগুলি একত্রে সুসম্পাদিত হইয়া গ্রথিত হইয়াছে। এতৎসহ দুইটি অধ্যায়ে রমেশচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সাধনা সমন্ধীয় আলোচনা রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে পাঠকের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা পরিতৃপ্ত করিবে।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাস রচনাবলীর এমন সুমুদ্রিত শোভন সংস্করণ প্রকাশের জন্য "প্রকাশক" বাঙ্গালী পাঠকের অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইবেন। আশাকরি সংসদের এই "ক্লাসিক" সাহিত্য প্রচার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে।

রমেশচন্দ্রের পরলোকগমনের অর্ধশতাব্দী পরে তাঁহার উপন্যাস রচনাবলীর একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার একটি প্রবন্ধ সংকলন হাতে পাইয়া রমেশচন্দ্রের অনুরাগী পাঠক মাত্রই আনন্দিত হইবেন। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রমেশচন্দ্রের প্রবন্ধগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করার জন্য সম্পাদক শ্রীনিখিল সেন মহাশয় বাঙ্গালী পাঠকের ধন্যবাদার্হ। এই পুস্তকে রমেশচন্দ্রের লিখিত ১৪টি প্রবন্ধ আহৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৮টি সাহিত্য বিষয়ক। অপর ছয়টি অর্থনৈতিক প্রবন্ধ—ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা, বৃটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি, ভারতীয় দুর্ভিক্ষ, বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত, ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল, ভারতবাসীদের দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের কারণ। অর্থনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে রমেশচন্দ্রের বাস্তব-দৃষ্টি, দেশ প্রেম ও নির্ভীকতার পরিচয় মিলিবে। শিল্প শ্রষ্টা রমেশচন্দ্রের পরিচয় তাঁহার উপন্যাসগুলিতে পাওয়া যায় —আলোচ্য প্রবন্ধাবলীতে তাঁহার বাস্তবধর্মী মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

রমেশচন্দ্র বহু বাংলা ও ইংরাজী গ্রন্থের রচয়িতা। এই সব পুস্তক বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদের অনুবাদ, সম্পাদিত হিন্দুশাস্ত্র (১-৯ ভাগ), হিস্ট্রি অব্ সিভিলিজেসন্ ইন এনসিয়ন্ট ইণ্ডিয়া (১৮৮৯) প্রভৃতি পুস্তক পুনর্মুদ্রিত ও প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। উৎসাহী প্রকাশক ও সম্পাদকদের দৃষ্টি যে রমেশচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে উপরোক্ত দুইখানি পুস্তক প্রকাশই তাহার প্রমাণ।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত